পূর্ব্ব কাণ্ড

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

একাদশ সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৬২

দুই টাকা

নিবেদন

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি যেসকল বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়া দিঙ্ নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর অলৌকিক দূরদৃষ্টি এবং অসাধারণ বহুদর্শিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যে শক্তিমান্ পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, উভয় জগতের মনীষিগণই স্তম্ভিত হইয়া অনতিকাল-পূর্ব্বে তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে, মঠে সর্ব্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্নেহে তাঁহার শিষ্যবর্গকে সর্ব্বদা শিক্ষা-দীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে কিরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন এবং সর্ব্বোপরি নিজ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনে-মরণে কিরূপ ভাবে অনুসরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তদ্বিষয়ের রিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে। আবার স্বামীজীর মতামত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত, স্বামীজীর বেলুড়-মঠস্থ গুরুভ্রাতৃগণের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়সকলের স্থানকালাদির নির্ণয়ও যথাসাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার

গ্রন্থখানির আদিতে সমগ্র পুস্তকের বিস্তৃত সূচীপত্র এবং গ্রন্থমধ্যস্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায়-নির্ণীত বিষয়সকলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গ্রন্থনিবদ্ধ প্রত্যেক বিষয় সহজে ধরিবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব গ্রন্থ-খানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। পরিশেষে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার পুস্তক-খানির সমুদয় স্বত্ব, বেলুড়-মঠের অধ্যক্ষের হস্তে শ্রীবিবেকানন্দের ঐ মঠস্থ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নিজ গুরুভক্তি-নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অলমিতি—

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসারদানন্দ

সূচীপত্র

পূর্ব্ব কাণ্ড

কাল—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

গ্রন্থখানির আদিতে সমগ্র পুস্তকের বিস্তৃত সূচীপত্র এবং গ্রন্থমধ্যস্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায়-নির্ণীত বিষয়সকলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গ্রন্থনিবদ্ধ প্রত্যেক বিষয় সহজে ধরিবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। পরিশেষে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার পুস্তকখানির সমুদয় স্বত্ব, বেলুড়-মঠের অধ্যক্ষের হস্তে শ্রীবিবেকানন্দের ঐ মঠস্থ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নিজ গুরুভক্তি-নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অলমিতি—

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসারদানন্দ

সূচীপত্র

পূর্ব্ব কাণ্ড

কাল—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম বল্লী

প্রথম দর্শন

স্থান—কলিকাতা, ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, বাগবাজার

স্বামীজীর সহিত শিষ্যের প্রথম পরিচয়—'মিরর্‌-সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আলাপন—ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় আলোচনা—ভারতবাসী কর্ত্তৃক পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম্মপ্রচারের ভবিষ্যৎ ফল—ধর্ম্ম ও রাজনীতি-চর্চ্চার মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা ভারতের ভাবী কল্যাণ—গোরক্ষাপ্রচারকের সহিত আলাপ—মানুষরক্ষা অগ্রে কর্ত্তব্য।

তিন-চারি দিন হইল স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের এখন আর আনন্দের অবধি নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্গতিপন্নেরা আবার এখন নিজ নিজ বাটীতে স্বামীজীকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইতেছেন। শিষ্যও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে বেলা প্রায় ২॥০টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' পাঠ করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ মহাশয়ের কাছে তাহার যে যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজী জানিয়াছিলেন।

শিষ্য স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম, ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—"বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী"—(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। কথাগুলি নাগ মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া 'বিবেকচূড়ামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—

"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥"

—"হে বিদ্বন! ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগর-পারের উপায় আছে। যাহা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন, সেই উৎকৃষ্ট পথ

আমি তোমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিব”—এবং তাহাকে আচার্য্য শঙ্করের ‘বিবেকচূড়ামণি’ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

শিষ্য কথাগুলি শুনিয়া ভাবিতে লাগিল, স্বামীজী তাহাকে ঐরূপে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণের জন্য সঙ্কেত করিতেছেন কি? শিষ্য তখন অতীব আচারী ও বেদান্তমতবাদী। গুরুকরণাদিতে এখনও তাহার মতি স্থির হয় নাই এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সে একান্ত পক্ষপাতী।

নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, ‘মিরর্’-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী সংবাদবাহককে বলিলেন, “তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।” নরেন্দ্র বাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নোত্তরে স্বামীজী বলিলেন—“আমেরিকাবাসীর মত এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসৎকারপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যাহা কিছু কার্য্য হইয়াছে তাহা আমার শক্তিতে হয় নাই; আমেরিকাদেশের লোক এত সহৃদয় বলিয়াই তাঁহারা বেদান্ত-ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।” ইংলণ্ডের কথা উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইংরেজের মত **conservative** (প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করিতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাহাদিগকে একবার কোন ভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা কিছুতেই

তাহা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অন্য কোন জাতিতে মিলে না। সেইজন্য তাহারা সভ্যতা ও শক্তিসঞ্চয়ে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়াছে।”

অনন্তর, উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্তকার্য্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা জানাইয়া বলিলেন —“আমি কেবল কার্য্যের পত্তন মাত্র করিয়া আসিয়াছি। পরবর্ত্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করিলে কালে অনেক কার্য্য হইবে।”

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা আছে?”

স্বামীজী বলিলেন, “আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্ত-ধর্ম্ম। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নাই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্ব্বভৌম বেদান্তবাদ—যাহাতে সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্ম্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে—ইহার প্রচারে পাশ্চাত্ত্য সভ্য জগৎ জানিতে পারিবে ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল এবং এখনও রহিয়াছে। এই মতের চর্চ্চায় পাশ্চাত্ত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইবে—অনেকটা এখনই হইয়াছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে আমরা তাহাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হইব। পক্ষান্তরে, তাহারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করিয়া পারমার্থিক কল্যাণলাভে সমর্থ হইবে।”

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাস করিলেন, “এই আদান-প্রদানে আমাদের

রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি ?” স্বামীজী বলিলেন, “ওরা (পাশ্চাত্ত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান ; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ হইয়া কার্য্য করিতেছে ; আপনারা যদি মনে করেন—আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তিপ্রয়োগ করিয়াই একদিন স্বাধীন হইব তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝিতেছেন। হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেরূপ, উহাদের ও আমাদের ঐ শক্তি-প্রয়োগকুশলতায় তদ্রূপ প্রভেদ। আমার মত কি জানেন ? আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচার করিয়া, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকিব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকিবে। ধর্ম্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্ত্যের পদতলে ধর্ম্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চীৎকার করে ওদের ‘এ দেও, ও দেও’ বললে কিছু হবে না। এই আদান-প্রদানরূপ কার্য্য দ্বারা যখন উভয় পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে তখন আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে। আমার বিশ্বাস এইরূপে ধর্ম্মের চর্চ্চায় ও বেদান্তধর্ম্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্ত্য দেশ উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চ্চা এর তুলনায় আমার নিকট গৌণ (secondary) উপায় বলিয়া বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে জীবনক্ষয় করবো।

আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন ত অন্যভাবে কার্য্য করে যান।”

নরেন্দ্র বাবু স্বামীজীর কথায় অবিসম্বাদী সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্ব্বোক্ত কথা-সকল শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত—মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা—দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা-প্রচারকের আগমনবার্ত্তা পাইয়া স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেন:

স্বামীজী। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে—সেখানে রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হয়।

স্বামীজী। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে ?

প্রচারক। মাড়োয়ারী বণিকসম্প্রদায় এ কার্য্যের বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁহারা এই সৎকার্য্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ৯ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করিয়াছে কি ?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে অন্ন দিয়া সাহায্য করা উচিত মনে করেন নাই ?

প্রচারক। না ; লোকের কর্ম্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল ; মুখ আরক্তিম হইল। কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন, "যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরিতেছে দেখিয়াও তাহার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া পশুপক্ষি-রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তাহার সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই—তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কর্ম্মফলে মানুষ মরছে

—এইরূপে কর্ম্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা আপন আপন কর্ম্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মচ্ছেন, আমাদের উহাতে কিছু করবার প্রয়োজন নাই।”

প্রচারক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “হাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য, কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।”

স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন, “হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি—তা না হইলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন ?”

হিন্দুস্থানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া—বোধ হয় স্বামীজীর বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না—স্বামীজীকে বলিলেন যে, এই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজী। আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাবো, যাতে আপনাদের সাহায্য করবো ? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, অগ্রে মানুষের সেবায় ব্যয় করবো ; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্ম্মদান করতে হবে। এসব করে যদি অর্থ বাকী থাকে তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন,

"কি কথাই বল্‌লে! বলে কি না—কর্ম্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে ইহাই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?"

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে, দুঃখে শিহরিয়া উঠিল। অনন্তর স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে শিষ্যকে বলিলেন, "আবার আমার সঙ্গে দেখা করো।"

শিষ্য। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়ত কোন বড় মানুষের বাড়ীতে থাকিবেন, আমাকে তথায় যাইতে দিবে ত?

স্বামীজী। সম্প্রতি আমি কখন আলামবাজার মঠে ও কখন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে থাকব। তুমি সেখানে যেও।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। তাই হবে—একদিন রাত্রিতে যেও। খুব বেদান্তের কথা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্ত্তায় রুষ্ট হইবে না ত?

স্বামীজী। তারাও সব মানুষ—বিশেষতঃ বেদান্তধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুশি হবে।

শিষ্য। মহাশয়, বেদান্তে যে সব অধিকারীর লক্ষণ আছে, তাহা আপনার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের ভিতরে কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে

বলে—অধীতবেদবেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধন-সম্পন্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয় না। আপনার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ, তাহাতে অশন-বসনে অনাচারী; তাহারা বেদান্তবাদ বুঝিল কি করিয়া?

স্বামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে তারা বেদান্ত বুঝেছে কি না।

স্বামীজী বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্য একজন নিষ্ঠাবান, আচারী হিন্দু। অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দর্জিপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বিতীয় বল্লী

স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও ৺গোপাললাল শীলের বাগানে

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

চেতনের লক্ষণ জীবন-সংগ্রাম-পটুতা—মনুষ্যজাতির জীবনীশক্তি-পরীক্ষারও ঐ নিয়ম—ভারতের জড়ত্বের কারণ, আপনাকে শক্তিহীন মনে করা—প্রত্যেকের ভিতরেই অনন্ত শক্তির উৎসস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান—উহা দেখাইতে বুঝাইতেই মহাপুরুষদিগের আগমন—ধর্ম্ম অনুভূতির বিষয়—তীব্র ব্যাকুলতাই ধর্ম্মলাভের উপায়—বর্ত্তমান যুগে গীতোক্ত কর্ম্মের আবশ্যকতা—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজা চাই—রজোগুণের উদ্দীপনা দেশে প্রয়োজন।

স্বামীজী অদ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ[১] মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল, স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন, "চল্ আমার সঙ্গে"। শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী ছাড়িল। চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গাদর্শন হইবামাত্র স্বামীজী আপন মনে সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন, "গঙ্গা-তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং" ইত্যাদি। শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত স্বরলহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর 'হাইড্রলিক্ ব্রিজের' দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ দেখি কেমন সিঙ্গির মত যাচ্ছে।" শিষ্য বলিলেন—"উহা ত জড়।

১ বাঙ্গালার সুবিখ্যাত নট ও নাটকরচয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তাগ্র ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

উহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তবে ত উহা চলিতেছে? ঐরূপে চলায় উহার নিজের বাহাদুরি আর কি আছে?"

স্বামীজী। বল্ দেখি চেতনের লক্ষণ কি?

শিষ্য। কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন।

স্বামীজী। যাহাই nature-এর against-এ rebel করে (প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে) তাহাই চেতন, তাহাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্ না, একটা সামান্য পিঁপড়ে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) করবে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ), সেইখানেই জীবনের চিহ্ন—সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ।

শিষ্য। মানুষের ও মনুষ্যজাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে, মহাশয়?

স্বামীজী। খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ্ না। দেখ্‌বি, তোরা ছাড়া আর সকল জাতি সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস্। তোদের hypnotise (মন্ত্রমুগ্ধ) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে তোদের অপরে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নাই। তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বচ্ছর হতে চলল ভাবছিস—আমরা হীন, সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস্।

(আপনার শরীর দেখাইয়া) এ দেহও ত তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে?—আমি কিন্তু কখনও ওরূপ ভাবি নাই। তাই দেখ্‌না তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মত খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাবতে পারিস যে, 'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অনন্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস ত তোরাও আমার মত হতে পারিস।

শিষ্য। ঐরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ঐ কথা শুনায় ও বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়? লেখাপড়া করা আজকাল কেবল চাকরিলাভের জন্য, এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি।

স্বামীজী। তাই ত আমরা এসেছি অন্যরূপ শিখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ, বোঝ, অনুভূতি কর—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগ, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস কর, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে। ঐ কথা সকলকে বল্ ও সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি **centre**

(শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার করবো—প্রথম তাদের শেখাব, তার পর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব মতলব করেছি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ করা ত অনেক অর্থসাপেক্ষ, টাকা কোথায় পাইবেন?

স্বামীজী। তুই কি বলছিস? মানুষেই ত টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, একথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস ত জলের মত টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং আপনি ঐরূপে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; তাহাতেই বা কি? ইতঃপূর্ব্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সব এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যেরও সময়ে ঐরূপ দশা হইবে, নিশ্চয়। তবে ঐরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি?

স্বামীজী। পরে কি হবে সর্ব্বদা একথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্য্যই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস তা এখনি কোরে ফেল্; পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু ত জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফলদাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) যাহা হয় করবেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগানবাড়ীতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে সেদিন বাগানে আসিয়াছেন। স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; স্বামীজীর বিলাতী শিষ্য গুডউইন সাহেব (Goodwin) মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায় অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় শিষ্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই কি কঠোপনিষদ্ কণ্ঠস্থ করেছিস্?"

শিষ্য। না মহাশয়, শাঙ্করভাষ্যসমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা হয় তোরা এখানা কণ্ঠে করে রাখিস। নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধা, সাহস, বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর্—শুধু পড়লে কি হবে।

শিষ্য। কৃপা করুন, যাহাতে দাসের ঐ সকল অনুভূতি হয়।

স্বামীজী। ঠাকুরের কথা শুনেছিস ত? তিনি বলতেন, 'কৃপা বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে কি রে বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জলবায়ু কেবল উহার সহায়ক মাত্র।

শিষ্য। বাহিরের সহায়তারও আবশ্যক আছে, মহাশয় ?

স্বামীজী। তা আছে, তবে কি জানিস—ভিতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মানুভূতির একটা সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ম। উচ্চনীচ-প্রভেদ করাটা কেবল ঐ ব্রহ্মবিকাশের তারতম্যে মাত্র। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'।

শিষ্য। কবে আর ঐরূপ হবে, মহাশয় ? শাস্ত্রমুখে শুনি, কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি।

স্বামীজী। ভয় কি ! এবার যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন এইবারেই হয়ে যাবে। মুক্তি—সমাধি—এসব কেবল ব্রহ্ম-প্রকাশের পথের প্রতিবন্ধগুলি দূর করে দেওয়া মাত্র। নতুবা আত্মা সূর্য্যের মত সর্ব্বদা জ্বলছেন। অজ্ঞানমেঘে তাঁকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘও সরিয়ে দেওয়া আর সূর্য্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি অবস্থা হওয়া। যত পথ দেখছিস সবই এই পথের প্রতিবন্ধ দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যে যে-ভাবে আত্মানুভব করেছে, সে সেই-ভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। ইহাতে সর্ব্বজাতি—সর্ব্বজীবের সমান অধিকার। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রের ঐ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ করে।

স্বামীজী। এরই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে যত বেড়ে যাবে ততই প্রতিবন্ধরূপ মেঘ কেটে যাবে। ততই শ্রদ্ধার সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবেন। অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে। কতকগুলি বিধি-নিষেধ সকলেই পালন করতে পারে, কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম-প্রাণতা। গোপীদিগের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যেমন উদ্দাম উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্যও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। গোপীদিগের মনেও একটু একটু পুরুষ-মেয়ে-ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানে লিঙ্গভেদ একেবারেই নাই।

বলিতে বলিতে 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা তুলিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন—

"জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে jingling of words (শ্রুতিমধুর বাক্যবিন্যাসের) দিকে বেশী নজর রেখেছেন। ছাখ্, দোখ গীতগোবিন্দের 'পততি পতত্রে' ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগ-ব্যাকুলতার কি culmination (পরাকাষ্ঠা) কবি দেখিয়েছেন? আত্মদর্শনের জন্য ঐরূপ অনুরাগ হওয়া চাই, প্রাণের ভিতরটা ছট্‌ফট্ করা চাই। আবার বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী তাও ছাখ্—অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর—শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জ্জুনকে গীতা বলছেন!—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই

ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্ত্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্ম্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না! যে দিকে চাইবি দেখ্‌বি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect (সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্ত্তিমান বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই; এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজান কৃষ্ণকেই কেবল দেখ্‌লে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা। তবে ত লোকে মহা উদ্যমে কর্ম্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি এদেশে এখন যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ক-বিকার অথবা বিচারশূন্য উৎসাহসম্পন্ন)—মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমোতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।”

শিষ্য। পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়া আপনার কি আশা হয়, তাহারা ক্রমে সাত্ত্বিক হইবে?

স্বামীজী। নিশ্চয়; মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। তাদের যোগ হবে না ত কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? তাদের উৎকৃষ্ট ভোগ দেখে আমার মেঘদূতের ‘বিদ্যুদ্বন্তঃ ললিতবসনাঃ’ ইত্যাদি চিত্র মনে পড়ে। আর তোদের ভোগের ভিতর হচ্ছে কি না, স্যাঁতস্যাঁতে

ঘরে ছেঁড়া কেঁথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের মত বংশবৃদ্ধি —begetting a band of famished beggars and slaves (ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও দাসকুলের জন্ম দেওয়া)! তাই বলছি এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্ম্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—এখন আর 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়', উহা ভিন্ন উদ্ধারের আর অন্য পথ নাই।

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন?

স্বামীজী। ছিলেন না? এই ত ইতিহাস বলছে তাঁরা কত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন—তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, সুদূর জাপানে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুণের ভিতর দিয়ে না গেলে উন্নতি হবার জো আছে কি?

কথায় কথায় রাত্রি আগত হইল। এমন সময় মিস্ মূলার (Miss Muller) আসিয়া পঁহুছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ রমণী; স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না। স্বামীজী শিষ্যকে ইঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিস্ মূলার (Miss Muller) উপরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী। দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা?—কোথায় বাড়ী ঘর—বড় মানুষের মেয়ে—তবু ধর্ম্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে।

শিষ্য। হাঁ মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অদ্ভুত! কত সাহেব মেম আপনার সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত—একালে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা।

স্বামীজী। (আপনার দেহ দেখাইয়া) শরীর যদি থাকে, তবে

আরও কত দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় করে দেব। মান্দ্রাজে জন কতক আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তি নাই। Brain (মস্তিষ্ক) ও muscles (মাংসপেশীসমূহ) সমানভাবে develop (পূর্ণাবয়বসম্পন্ন) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet. (দৃঢ়বদ্ধশরীর ও বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন হলে জগৎকে পদানত করা যায়)।

সংবাদ আসিল, স্বামীজীর খাবার প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "চল্, আমার খাওয়া দেখবি।" আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—"মেলাই তেল চর্ব্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচি হতে রুটি ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh vegetable (তাজা তরি-তরকারি) খাবি, মিষ্টি কম।" বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, ক'খানা রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে?" কত খাইয়াছেন তাহা স্বামীজীর স্মরণ নাই। ক্ষুধা আছে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না! কথা কহিতে কহিতে তাঁহার শরীরজ্ঞান এতটা কমিয়া গিয়াছে!

আরও কিছু খাইয়া স্বামীজী আহার শেষ করিলেন। শিষ্যও বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ী না পাওয়ায় পদব্রজে চলিল। চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিবে।

তৃতীয় বল্লী

স্থান—কাশীপুর, ৺গোপাললাল শীলের বাগান

বর্ষ—১৮৯৭

স্বামীজীর অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ—কলিকাতার বড়বাজার-পল্লীর বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণের স্বামীজীকে দেখিতে আগমন—পণ্ডিতগণের সহিত স্বামীজীর সংস্কৃতভাষায় শাস্ত্রালাপ—স্বামীজীর সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ধারণা—গুরুভ্রাতাগণের স্বামীজীর প্রতি ভালবাসা—সভ্যতা কাহাকে বলে—ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিশেষত্ব—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্মিলনে নবযুগাবির্ভাব—পাশ্চাত্ত্য ধার্ম্মিক লোকের বাহ্যিক চালচলন সম্বন্ধে ধারণা—ভাবসমাধি ও নির্ব্বিকল্প-সমাধির প্রভেদ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবরাজ্যের রাজা—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই যথার্থ লোকগুরু—কুলগুরুপ্রথার অপকারিতা—ধর্ম্মগ্লানি দূর করিতেই ঠাকুরের আগমন—স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যে ঠাকুরকে কিভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া কয়েক দিন কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিয়াছিলেন। শিষ্য তখন প্রতিদিন তথায় যাতায়াত করিত। শুধু শিষ্য কেন, স্বামীজীর দর্শনমানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের তথায় ভিড় হইত। Miss Muller (মিস্ মূলার) স্বামীজীর সঙ্গে আসিয়া এখানেই প্রথম অবস্থান করিয়াছিলেন ; শিষ্যের গুরুভ্রাতা Goodwin (গুডউইন সাহেব) এই বাগানেই স্বামীজীর সঙ্গে থাকিতেন।

স্বামীজীর সুখ্যাতি তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। সুতরাং কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজীর জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিতে তখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিত।

শিষ্য দেখিয়াছে, প্রশ্নকর্ত্তারা স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উক্তির প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিত। স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। এই বাগানে অবস্থানকালে তাঁহার অলৌকিক যোগদৃষ্টিরও সময়ে সময়ে পরিচয় পাওয়া যাইত।[১]

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। অর্থবান মাড়োয়ারী বণিকগণের অন্নেই ইঁহারা প্রতিপালিত। ঐ সকল বেদজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণও এ সময়ে স্বামীজীর সুনাম অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার মানসে একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন তথায় উপস্থিত ছিল।

আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। কোন্ বিষয় লইয়া স্বামীজীর সঙ্গে সেদিন পণ্ডিতগণের বাদানুবাদ হয়, তাহা শিষ্যের ইদানীং স্মরণ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয় যে, পণ্ডিতেরা

---

১ এই বাগানে অবস্থানকালে স্বামীজী একদিন একটি প্রেতাত্মার ছিন্নমুণ্ড দেখিতে পান। সে যেন করুণকণ্ঠে সদ্যোমৃত্যুর মুখ হইতে প্রাণভিক্ষা করিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া স্বামীজী পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্য-সত্যই ঐ বাগানে কোন ব্রাহ্মণের অপঘাতে মৃত্যু হয়। এই ঘটনা তিনি পরে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের কাছে প্রকাশ করেন।

সকলেই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্ত-গুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃত-ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতে-ছিল। পণ্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে ঐরূপে অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে সংস্কৃত-আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্ত্রদর্শী এইসকল পণ্ডিতের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন ঐ সভায় রামকৃষ্ণানন্দ, যোগানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দ স্বামী মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী পণ্ডিতগণের সহিত বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিয়া-ছিলেন এবং পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষবাদী হইয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী এক স্থলে 'অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্"—আমি পণ্ডিতগণের দাস; আমার এই ব্যাকরণস্খলন ক্ষমা করুন। পণ্ডিতেরাও স্বামীজীর ঈদৃশ দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানু-বাদের পরিশেষে সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ

স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই-চারি জন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ হইল?" তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।"

স্বামীজীর উপর তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সর্ব্বদা কি অদ্ভুত ভালবাসাই দেখা যাইত! পণ্ডিতগণের সঙ্গে স্বামীজীর যখন খুব তর্ক বাধিয়া গিয়াছে তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে হলের উত্তর পাশের ঘরে বসিয়া শিষ্য জপ করিতে দেখিতে পায়। পণ্ডিতগণের গমনান্তে শিষ্য তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারে যে, স্বামীজীর জয়লাভের জন্যই তিনি একান্তমনে ঠাকুরের পাদপদ্মে জানাইতেছিলেন।

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে শিষ্য স্বামীজীর নিকট শ্রবণ করে যে, পূর্ব্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বামীজী উত্তরমীমাংসা পক্ষ-অবলম্বনে তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান-কাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও স্বামীজীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটি ভুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে স্বামীজীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা না বলায় তাঁহার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিত-গণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষার্পণ করেন নাই। ঐ

বিষয়ে স্বামীজী ইহাও কিন্তু বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছাড়িয়া ঐরূপে ভাষায় সামান্য ভুল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্যজ্ঞাপক। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই লয়—ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। "তোদের দেশে কিন্তু খোসা লইয়াই মারামারি চলছে—ভিতরকার শস্যের কেহই অনুসন্ধান করে না।" এই বলিয়া স্বামীজী শিষ্যের সঙ্গে সেদিন সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল। তথাপি তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত।

'সভ্যতা' কাহাকে বলে—তদুত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেন যে, যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্ব্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করিয়া লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করিতে না পারিলেও অনেকটা কমাইতে নিঃসন্দেহে সমর্থ হইয়াছিল। ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করিতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্ম্ম-তৎপর হইতে হইবে, অপরদিকে তাঁহাকে তেমনি গভীর অধ্যাত্ম-

জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যোন্যসংমিশ্রণে জগতে যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে, একথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্ম্মপরায়ণ হবে, সে বাহিরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে; মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্ম্মকথা শুনে ওদেশের ধর্ম্মযাজকেরা যেমন অবাক্ হয়ে যেতো, বক্তৃতান্তে বন্ধুবান্ধবদের সহিত ফষ্টিনাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক্ হয়ে যেতো। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেল্‌তো, 'স্বামীজী, আপনি একজন ধর্ম্মযাজক, সাধারণ লোকের মত এরূপ হাসি-তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ওরূপ চপলতা শোভা পায় না।' তদুত্তরে আমি বলতাম, 'We are children of bliss—why should we look morose and sombre?' (আমরা আনন্দের সন্তান, আমরা বিরস বদনে থাক্‌ব কেন?) ঐ কথা শুনে তারা মর্ম্মগ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ।"

সেদিন স্বামীজী ভাবসমাধি ও নির্ব্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও নানা কথা বলিয়াছিলেন। যতদূর সাধ্য নিম্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করা গেল।

"মনে কর, একজন হনুমানের মত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হতে থাকবে ঐ সাধকের চলন-বলন, ভাবভঙ্গী, এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আসবে। 'জাত্যন্তরপরিণাম' ঐরূপেই হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে তদাকারাকারিত হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের

চরমাবস্থার নামই 'ভাবসমাধি'। আর 'আমি দেহ নই', 'মন নই', 'বুদ্ধি নই'—এইরূপে 'নেতি', 'নেতি' করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হলে নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌঁছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে। ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাবমুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না—একথাও ঠাকুর বলতেন।"

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, ওদেশে কিরূপ আহারাদি করিতেন?"

স্বামীজী। ওদেশের মতই খেতুম। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় না।

এদেশে তিনি ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, তৎসম্বন্ধেও ঐদিন স্বামীজী বলেন যে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করিয়া সর্ব্ববিধ লোককল্যাণার্থ নূতন ধরণে সাধুসন্ন্যাসী তৈয়ারী করিবেন। আরও বলিলেন যে, destruction দ্বারা বা প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গড়িয়াই হইয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঐরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম destructive (প্রাচীন রীতিনীতির ধ্বংসকারী) ছিল। সেইজন্য ঐ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

শিষ্যের মনে হয়, স্বামীজী ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে

লাগিলেন—একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। একথা সর্ব্বশাস্ত্রে ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছে। সেই জন্যই সাধন করিয়াও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মের এইসকল গ্লানি দূর করিতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরধারণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত সার্ব্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হইলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হইবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে ইতঃপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ওদেশে সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?"

স্বামীজী। ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসতো, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা বলতো, 'ও আর তুমি নূতন কি বলছো— আমাদের প্রভু ঈশাই ত রয়েছেন।'

তিন-চারি ঘণ্টাকাল ঐরূপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সেদিন অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

চতুর্থ বল্লী

স্থান—শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ী

রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া

বর্ষ—১৮৯৮ (জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী)

নবগোপাল বাবুর বাটীতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা—স্বামীজীর দীনতা—নবগোপাল বাবুর পরিবারস্থ সকলের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম-মন্ত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত বাটীর নিমিত্ত জমি ক্রয় করিবার সময় স্থানটির 'রামকৃষ্ণপুর' নাম জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন; কারণ ঐ গ্রামের নাম করিলেই তাঁহার ইষ্টদেবের কথা স্মরণে আসিবে। বাড়ী তৈয়ার হওয়ার কয়েকদিন পরেই স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং ঘোষজ ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী দ্বারা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। ঘোষজ মঠে যাইয়া ঐ কথা কয়েকদিন পূর্ব্বে উথাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। নবগোপাল বাবুর বাটীতে আজ তদুপলক্ষে উৎসব—মঠধারী সন্ন্যাসী ও ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায় ঐ জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাড়ীখানি আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজী-সমভিব্যাহারে মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালকব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের দুইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী "দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরঘরে" গানটি করিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল; যাইতে যাইতে দলটি শ্রীযুক্ত রামলাল ডাক্তার বাবুর বাড়ীর কাছে অল্পক্ষণ দাঁড়াইল। রামলাল বাবুও শশব্যস্তে বাটীর বাহির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামীজী কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল, তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' স্বামীজীর এই অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে এবং 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত করিতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপাল বাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম', 'জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোরসিলেনের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর ঠাকুরপূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণীঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ—আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।"

স্বামীজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস

করেন নি। সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম; যেন-তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাকবেন?" সকলেই স্বামীজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আবাহন করিলেন।

পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই উহা সম্পাদন করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। নীচে সমাগত ভক্তমণ্ডলী অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী উপরেই রহিলেন, বাড়ীর মেয়েরা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

শিষ্য পরিবারস্থ সকলের রামকৃষ্ণগতপ্রাণতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং ইঁহাদিগের সঙ্গে আপন নরজন্ম সার্থক বোধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে নীচে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাগমে সেই ভক্তসঙ্ঘ ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। শিষ্য ও স্বামীজীর সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

পঞ্চম বল্লী

স্থান—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও আলমবাজার মঠ।

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ্চ মাস

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শেষ জন্মোৎসব—ধর্ম্মরাজ্যে উৎসব-পার্ব্বণাদির প্রয়োজন—অধিকারিভেদে সকল প্রকার লোকব্যবহারের আবশ্যকতা—স্বামীজীর ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য একটি নূতন সম্প্রদায়গঠন নহে।

স্বামীজী যে সময়ে ইংলণ্ড হইতে প্রথমবার ফিরিয়া আসেন, তখন আলমবাজারে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঠের বাড়ীটাকে লোকে 'ভূতের বাড়ী' বলিত। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সংসর্গে ঐ ভূতের বাড়ী রামকৃষ্ণতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। তথায় কত সাধন-ভজন, কত জপ-তপস্যা, কত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ ও নামকীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার আর পরিসীমা নাই। কলিকাতায় রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়া স্বামীজী ঐ ভগ্ন মঠেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর, কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একমাস কাল থাকিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেস্থানেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিয়া দর্শনোৎসুক জনসঙ্ঘের সহিত ধর্ম্মালাপাদি করত তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্ত্তী। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। রামকৃষ্ণসেবকগণের ত কথাই নাই, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ ও উৎসাহের পরিসীমা নাই। কারণ বিশ্ববিজয়ী স্বামীজী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া এ বৎসর প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ আজ তাঁহাকে পাইয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গসুখ অনুভব করিতেছেন। কালীমন্দিরের দক্ষিণে বিস্তৃত রন্ধনশালায় ভোগ প্রস্তুত হইতেছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েক-জন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা—১০টা আন্দাজ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দিত রূপ দর্শন করিবে, সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং তাঁহার শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। তাই আজ আর স্বামীজীর তিলার্দ্ধ বিশ্রামের সময় নাই। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য লোক। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে ৺রাধাকান্তজীউকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের বাসগৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ীর দিঙ্‌মুখসকল মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শককে ক্রোড়ে করিয়া বার বার কলিকাতা হইতে হোর্ মিলার কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। এবারকার এই উৎসব প্রাণে বুঝিবার জিনিস—ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে!

স্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় শিষ্যের এখনও হয় নাই।

স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে এখনও তেমন বিশেষ পরিচয় না হইলেও শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ঐ উৎসবসম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজীও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।"

পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশ বাবু[১] পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহুজনসমভিব্যাহারে স্বামীজী গিরিশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া "এই যে ঘোষজ!" বলিয়া গিরিশ বাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশ বাবুও তাঁহাকে করযোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশ বাবুকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "ঘোষজ,. সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশ বাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "তা বটে; তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।" এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে-সকল কথা হইল তাহার মর্ম্ম বাহিরের লোকের অনেকেই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজী পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বামীজী চলিয়া যাইলে গিরিশ বাবু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া

১ মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বলিলেন, "একদিন হরমোহন (মিত্র) কি খবরের কাগজ দেখে এসে বললে যে, স্বামীজীর নামে আমেরিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলেম, নরেনকে যদি নিজচক্ষে কিছু অন্যায় করতে দেখি তবে বলবো আমার চক্ষের দোষ হয়েছে—চোক্ উপড়ে ফেলবো। ওরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে ? যে-কেউ ওদের দোষ ধরতে যাবে, তাদের নরক হবে।" এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আসিলেন এবং একটা থেলো হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে কলম্বো হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণ শ্রীস্বামীজীকে যে অপূর্ব্বভাবে আদর-অভ্যর্থনাদি করিয়াছে এবং তিনি তাহাদের যে-সকল অমূল্য উপদেশ বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছেন, তাহার কতক কতক বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও শ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলারা ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া

দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

বেলা তিনটার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "একখানা গাড়ী ত্যাখ্—মঠে যেতে হবে।" অনন্তর আলমবাজার পর্য্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ীর একদিকে বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "কেবল abstract idea (জীবনে ও কার্য্যে অপরিণত ভাব) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এইসকল উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে ত mass-এর ভেতর এইসকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্ম্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণলোকে ঐ-সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐসকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য ওগুলি ধর্ম্মের বহিরাবরণ, প্রকৃত ধর্ম্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

"কিন্তু যারা ধর্ম্ম কি, আত্মা কি, এসব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তাঁরা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর্, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যাঁর নামে এত লোক একত্রিত হয়েছিল, তিনি কে,

তাঁর নামেই বা এত লোক এল কেন—একথা তাদের মনে উদয় হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্ত্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।”

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐ উৎসব-কীর্ত্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে কি? আমাদের দেশে ষষ্ঠীপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাঁড়াইবে। মরণ পর্য্যন্ত লোকে ঐসব করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই এমন লোক ত দেখিলাম না, যে ঐসকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া উঠিল!

স্বামীজী। কেন? এই যে ভারতে এত ধর্ম্মবীর জন্মেছিলেন—তাঁরা ত সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর ঐ সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংস্থিতির জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য। লোক-দেখান মানিতে পারেন—কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐসকল বাহ্য লোকব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে?

স্বামীজী। কেন পারবে না? সত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাও ত relative—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল

ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর যেমন বলতেন, "মা কোন ছেলেকে পোলাও কালিয়া রেঁধে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন"—সেইরূপ।

শিষ্য কথাটি এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আলমবাজার মঠে উপস্থিত। শিষ্য গাড়ীভাড়া দিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজীর পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল। স্বামীজী জলপান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন ভিড় উৎসবে আর কখন হয় নি। যেন কলকাতাটা ভেঙ্গে এসেছিল।"

স্বামীজী। তা হবে না? এর পর আরও কত কি হবে!

শিষ্য। মহাশয়, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই দেখা যায় কোন না কোন বাহ্য উৎসব-আমোদ আছেই। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দেখিয়াছি শিয়াসুন্নীতে লাঠালাঠি হয়।

স্বামীজী। সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্পাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি জানিস্?—সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন—আবার বলতেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে ওসকলই মিথ্যা মায়া মাত্র।"

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া

ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্ম্মকেই তিনি বহুমান দিতেন।

স্বামীজী। তুই কি করে জান্‌লি, আমরা সকল ধর্ম্মমতকে ঐরূপে বহুমান দিই নাই?

এই বলিয়া স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে, এ বাঙ্গাল বলে কি?"

শিষ্য। মহাশয়, কৃপা করিয়া ঐ কথা আমায় বুঝাইয়া দিন।

স্বামীজী। তুই ত আমার বক্তৃতা পড়েছিস্। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম্মই ত জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য। তা বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন ইতরসাধারণকে তাহা একেবারে বলিয়া দিন না।

স্বামীজী। আমি যা বুঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদান্তের অদ্বৈতমতটিকে ঠিক ধর্ম্ম বলে বুঝে থাকিস্, তা হলে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন?

শিষ্য। আগে অনুভব করিব, তবে ত বুঝাইব। ঐ মত আমি শুধু পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। তবে আগে অনুভূতি কর্। তারপর লোককে বুঝিয়ে দিবি। এখন লোকে প্রত্যেকে যে এক একটা মতে বিশ্বাস

কোরে চলে যাচ্ছে—তাতে তোর ত বলবার কিছু অধিকার নাই। কারণ, তুইও ত এখন তাদের মত একটা ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে চলেছিস্ বই ত নয়।

শিষ্য। হাঁ, আমিও একটা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ—শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজী। শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ্ প্রমাণ হলে, বাইবেল জেন্দাবেস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য। এইসকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মত উহারা ত আর প্রাচীন গ্রন্থ নহে। আবার আত্মতত্ত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, এমন ত আর কোথাও নাই।

স্বামীজী। বেশ, তোর কথা নয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নাই, একথা বলবার তোর কি অধিকার?

শিষ্য। বেদ ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মেনে যাব। আমার এতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজী। তা কর্, তবে আর কারও যদি ঐরূপ কোন মতে 'খুব' বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস্। দেখ্ বি—পরে তুই ও সে এক জায়গায় পৌঁছিবি। মহিম্নস্তবে পড়িস্ নি?—"ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

ষষ্ঠ বল্লী

স্থান—আলমবাজার মঠ

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাস

স্বামীজীর শিষ্যকে দীক্ষাদান—দীক্ষার পূর্ব্বে প্রশ্ন—যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদের কথা—আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণ-চিন্তনে যাহাতে সর্ব্বদা মনকে নিবিষ্ট রাখে তাহাই দীক্ষা—পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি 'অহং'-ভাব হইতে—ক্ষুদ্র আমিত্বের ত্যাগেই আত্মার প্রকাশ—মনের লোপেই যথার্থ আমিত্বের প্রকাশ—সেই 'আমি'র স্বরূপ—'কালেনাত্মনি বিন্দতি।'

স্বামীজী দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। শিষ্যের জীবনের প্রথম পথ-প্রদর্শক নাগ মহাশয় তাহাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন নাই এবং মন্ত্রগ্রহণের কথা তুলিলে স্বামীজীর কথা পাড়িয়া তাহাকে বলিতেন, "স্বামীজী মহারাজ জগতের গুরু হইবার যোগ্য।" দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিষ্য সেজন্য স্বামীজীকে দার্জ্জিলিং-এ ইতঃপূর্ব্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজী তদুত্তরে লিখেন, "নাগ মহাশয়ের আপত্তি না হইলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করিব।" চিঠিখানি শিষ্যের নিকটে এখনও আছে।

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য

দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, "আজ তোকে 'বলি' দিতে হবে—না?"

স্বামীজী শিষ্যকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবনগঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়—এসকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, "আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি ত? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তাহলে তাও অবিচারে করতে পারবি ত? এখনও ভেবে দেখ্; নইলে সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগুস্ নি।" এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের মনের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজী। যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা 'সমিৎপাণি' হয়ে গুরুর আশ্রমে গমন করত। গুরু অধিকারী বলে বুঝলে তাকে দীক্ষিত করে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ

ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপিন এঁটে বেঁধে রাখত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, আমাদের ন্যায় সুতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয় ?

স্বামীজী। বেদে কোথাও সুতোর পৈতের কথা নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও লিখেছেন—"অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ।" সুতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নাই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে 'উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই ত তোদের বলি, তোরা প্রাচীনকালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল্। নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর্। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন্। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা—আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্মা-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তা'হলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে কতকগুলো হাড়মাসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড়মাস দান কর্। শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীত-

বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—“নাত্র কার্য্যবিচারণা।” এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্—“অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।”

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না যাইয়া বাড়ীতেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করত পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ‘বাবা আয়’ বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, “দোরে খিল দে।” সেইরূপ করা হইলে বলিলেন, “স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।” স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দান করিলে মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে

শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শিষ্যের মন এখন স্তব্ধ ও একাগ্র হওয়ায় সে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "গুরুদক্ষিণা দে।" শিষ্য বলিল, "কি দিব?" শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, "যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।" শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেইগুলি সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।" শিষ্য ঠাকুরঘরে স্বামীজীর নিকটে যখন দীক্ষিত হইতেছিল, তখন মঠের অপর এক ব্যক্তি সহসা দীক্ষিত হইতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বারে বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন ব্রহ্মচারিরূপে মঠভুক্ত হইলেও ইতঃপূর্ব্বে তান্ত্রিকী দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই; শিষ্যকে অদ্য ঐভাবে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া তিনিও এখন ঐবিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামীজীও স্বামী শুদ্ধানন্দের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়া পুনরায় পূজার আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শুদ্ধানন্দজীকে দীক্ষাদান করিয়া স্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতোমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত রহিল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল ?"

স্বামীজী। বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি-তুমি' ভাব—যা থেকে এই সব ধর্ম্মাধর্ম্ম-দ্বন্দ্বভাবসকল এসেছে, কমে যায়। 'আমা থেকে অমুক ভিন্ন'—এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।"

যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (weakness is sin)। এই দুর্ব্বলতা থেকেই হিংসা-দ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্ব্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ করছে—সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' করছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্ব্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্ত্তমান।

শিষ্য। তাহা হইলে এইসকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে ?

স্বামীজী। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই আমি 'আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে পাপ পাপ বলে, সেটা weakness-এর ফল—'আমি

দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, " 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

শিষ্য। মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না! এটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজী। এক ভাবে খুব কঠিন আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। 'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিসটে নাই, তার আবার মারামারি কি? আমিত্বরূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (মন্ত্রমুগ্ধ) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ও দেখা যায়—এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন—এ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য্য আপনার প্রভায় আপনি জ্বল্‌ছে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বসংবেদ্য। যে জিনিসটে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি করে জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" তুই যা কিছু জানছিস, তা মনরূপ কারণ-সহায়ে। মন ত জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি? তবে এইটেমাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌছুতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌছুতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্য্যন্ত। তারপর মন যখন বিকল্প বা বৃত্তিহীন

হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনটাই ত 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'টাও ত আর থাকিবে না।

স্বামীজী। তখন যে অবস্থা, সেটাও যথার্থ 'আমিত্বের' স্বরূপ। তখন যে 'আমি'টা থাকবে, সেটা সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বগ—সর্ব্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙ্গে মহাকাশ—ঘট ভাঙ্গলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র 'আমি'টাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্ব্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা গেল, তাতে যথার্থ 'আমি' বা আত্মার কি?

যা বলছি তা কালে প্রত্যক্ষ হবে—'কালেনাত্মনি বিন্দতি।' শ্রবণ-মনন করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে—আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন—"এই সহজ বিষয়টা বুঝাতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝতে পারছে না!—আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকৃতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানুষজন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য্য প্রভাব! মা! মা!!"

সপ্তম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭

রামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া স্বামীজীর কলিকাতায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতি গঠন করা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ভাবপ্রচার সম্বন্ধে মতামত—স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি ভাবে দেখিতেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে কি ভাবে দেখিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযোগানন্দ স্বামীর কথা—নিজ ঈশ্বরাবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—অবতারত্বে বিশ্বাস করা কঠিন, দেখিলেও হয় না ; একমাত্র কৃপাসাপেক্ষ—কৃপার স্বরূপ ও কীদৃশ ব্যক্তি ইহা লাভ করে—স্বামীজী ও গিরিশ বাবুর কথোপকথন।

স্বামীজী কয়েক দিন হইতে বাগবাজারে ৺বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ একত্রিত হইতে আহ্বান করায়, ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়ীতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

"নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা, বা সাধারণের সম্মতি (ভোট্) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্ত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নহে। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই

দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদরযত্ন করেছে। এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন ইতরসাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কার্য্য চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘের একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কার্য্য করা হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্য্যে সহায় হোন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবী কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নাম রাখা হইল—রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি আমরা উহার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য: মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্য্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্য্যপ্রণালী : মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্দ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্য : ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশদেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায়-অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্য্যবিভাগ : ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী'-প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রমসংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতাকেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্ণী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারী এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার

পর ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্ব্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "এইরূপে কার্য্য ত আরম্ভ করা গেল; এখন দ্যাখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।"

স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ সব বিদেশী ভাবে কার্য্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?

স্বামীজী। তুই কি করে জান্‌লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস্? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা, পাঠ প্রবর্ত্তনা করতে কখনও উপদেশ দেন নাই। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি করে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয় নাই। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে

আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী কথার প্রতিবাদ না করায় স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: "প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়ায়ে এসব কার্য্য করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্র ছিল না, যখন কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কার্য্য করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।"

স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা ত চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সকল করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খট্‌কা আসে—ঠাকুরের কার্য্য-প্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না। তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না ত? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।

স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়।

ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় ত, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নাই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে আমাকে যন্ত্র করে এইরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব, বল?

এই বলিয়া স্বামীজী কার্য্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হত ত ধন্য হতুম।"

শিষ্য। মহাশয়, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন?

যোগানন্দ। তিনি বলতেন, 'এমন আধার এ যুগে জগতে আর কখন আসে নি।' কখনও বলতেন, 'নরেন পুরুষ—তিনি প্রকৃতি—নরেন তাঁর শ্বশুর ঘর।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের থাক।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবী-সকলও ব্রহ্ম হতে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেন নাই, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।' কখন বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর ঋষির অবতার।' কখনো বলতেন, 'শুকদেবের মত মায়া স্পর্শ করতে পারে নি।'

শিষ্য। ঐ কথাগুলি কি সত্য? না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিতেন?

যোগানন্দ। তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুত না।

শিষ্য। তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ। তুই বুঝতে পারিস নি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য।

শিষ্য শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ইতোমধ্যে স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "তোদের ওদেশে ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে লোকে জানে কি?"

শিষ্য। মহাশয়, এক নাগ মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার একথা ওদেশের লোকেরা এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস করে না।

স্বামীজী। ও কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে ঐ কথা বারম্বার শুনলুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস করলুম তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, এ কথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী। কতবার বলেছেন। আমাদের সব্বাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন শরীর যায় যায় তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পার 'আমি ভগবান', তবে বিশ্বাস করব 'তুমি সত্যসত্যই ভগবান'। তখন শরীর যাবার দুই দিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "যে রাম,' যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হলো না—সন্দেহ, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—ত অপরের কথা আর কি বলব? আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে নির্দ্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এসব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি, মথুর বাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে

কত কি দেখিয়াছিলেন! তাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশ্বাস হইয়াছিল।

স্বামীজী। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না, মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল—অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হল। দুর্য্যোধন ভেল্কিবাজি ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝবার জো নাই। না দেখে না শুনে কারও ষোলআনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য। কৃপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়?

স্বামীজী। হাঁও বটে, নাও বটে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎবিচারবান্ ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বলতেন, "তাঁর ছেলের স্বভাব"—সেজন্য দেখা যায় কেউ কোটী জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না, আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভিতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়—তাকে ভগবান অযাচিত কৃপা করে বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি

ছিল, একথা বলতে পারিস্; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, "তাঁর প্রতি নির্ভর কর্। ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা", আবার কখনও বলতেন, "তাঁর কৃপা-বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।"

শিষ্য। মহাশয়, এ ত মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এখানে দাঁড়ায় না।

স্বামীজী। যুক্তিতর্কের সীমা মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)-ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম)-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন; আবার সে সকলের বাইরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে তন্মুহূর্তে নিয়মের গণ্ডির বাইরে (beyond law) চলে যায়। সেইজন্য কৃপার কোন condition (বাঁধাধরা নিয়ম) নাই; কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ-সৃষ্টিটাই সব তাঁর খেয়াল—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" যিনি খেয়াল করে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙ্গতে পারেন, তিনি কি আর কৃপা করে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না? তবে যে কারুকে সাধনভজন করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য। মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না।

। বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস্ তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্। তা হলেই এই জগৎভেল্কি আপনি-আপনি ভেঙ্গে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে

মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎবিচার সর্ব্বদা করতে হবে, 'আমি দেহ নই'—এইরূপ বিদেহ ভাবে অবস্থান করতে হবে, 'আমি সর্ব্বগ আত্মা'—এইটি অনুভব করতে হবে। এইরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হল পরম পুরুষার্থ।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, "তাঁর কৃপা তোদের প্রতি না থাকলে তোরা এখানে আস্‌বি কেন? ঠাকুর বলতেন, 'যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আসবেই আসবে; যেখানে-সেখানে থাক্‌ বা যাই করুক না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে।' তোর কথাই ভেবে দেখ্‌ না, যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ—যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক বুঝেছেন, সেই নাগ মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? 'অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌'—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাকলে তবে অমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন,' তা একমাত্র নাগ মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙ্গাল দেশ ধন্য—নাগ মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।"

বলিতে বলিতে স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশ বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা কার, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দেই, ইত্যাদি।

আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি—সম্প্রদায় হোক্। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেন নাই ; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বল ?"

গিরিশ বাবু। আমি আর কি বলব ? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কার্য্য করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।

স্বামীজী। আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কার্য্য করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না !

গিরিশ বাবু। তিনি বলেছিলেন, "সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে ?"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশ বাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি, ঐরূপ কথা বেশী কহিতে কহিতে স্বামীজীর সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়—তিনি যে কে একথা জানতে পারেন—তবে আর এক মুহূর্ত্তও তাঁর দেহ থাকবে না।" তাই দেখিয়াছি, স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও

তিনি চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজীকে প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করাইতেন। সে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস· ইত্যাদি নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীকে শিষ্যের রন্ধন করিয়া ভোজন করান—ধ্যানের স্বরূপ ও অবলম্বন সম্বন্ধে কথা—বহিরালম্বন ধরিয়াও মন একাগ্র করিতে পারা যায়—মন একাগ্র হইবার পরেও সাধকের মনে বাসনার উদয় পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে—মনের একাগ্রতায় সাধকের ব্রহ্মাভাস ও নানা প্রকার বিভূতিলাভের দ্বার খুলিয়া যায়—ঐ সময়ে কোনরূপ বাসনাদ্বারা চালিত হইলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় না।

কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক—কলেজের বহু ছাত্র—তিনি এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে ধর্ম্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজীর প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্য্যগ্রহণ—সর্ব্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্ব্বিদ্গণও গ্রহণ দেখিতে নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর কিন্তু গ্রহণসম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্য আজ স্বামীজীকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সে ৺বলরাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত

হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, "তোদের দেশের মত রান্না করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।"

বলরাম বাবুদের বাড়ীতে মেয়েছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ী একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ীর ভিতরে রন্ধন-শালায় গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীনমাতা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধন-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও বা "দেখিস্ 'মাছের জুল' যেন ঠিক বাঙ্গালদিশি ধরণে হয়" বলিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ভাত, মুগের দাল, কৈ মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তুনি রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই পাতা করিয়া খাইতে বসিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকী আছে—বলিলেও শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মতন বলিলেন, "যা হয়েছে শীগ্‌গির নিয়ে আয়, আমি আর বস্‌তে পাচ্ছি নে, খিদেয় পেট জলে যাচ্ছে।" শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের সুক্তুনি ও ভাত দিয়ে গেল, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজীকে অন্য সকল তরকারি আনিয়া দিবার পর যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল

না; কিন্তু স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তুনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে কিন্তু তিনি সেই সুক্তুনি খাইয়া খুশি হইয়া বলিলেন —"এমন কখনও খাই নাই! কিন্তু মাছের 'জুল'টা যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।" টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "এটা ঠিক যেন বর্দ্ধমানী ধরণের হয়েছে।" অনন্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।"

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "ওরে গেরণ লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।" এই বলিয়া একটুকু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, 'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদ-সেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' এই ভাবিয়া শিষ্য শান্ত মনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মত তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২০ মিনিট বাকী আছে, তখন স্বামীজী উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্যকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকে বলে, গেরণের সময় যে যা করে সে তাই নাকি কোটীগুণে পায়—তাই ভাবলুম,

মহামায়া এ শরীরে স্থনিদ্রা দেন নাই, যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি ত এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হল না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।"

অনন্তর সকলে স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতঃপূর্ব্বে কখনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। স্থতরাং শিষ্য উঠিয়া "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে 'গুরুভক্তি' ও 'ত্যাগের' মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংসা করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, "আহা! সুন্দর বলেছে।"

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন স্বামীকে স্বামীজী কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় 'ধ্যান' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর স্বামী প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও ঐরূপ করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকি আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, "তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে বল্।"

শুদ্ধানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?"

স্বামীজী। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে-কোন বিষয়ে হোক্ না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

শিষ্য। শাস্ত্রে যে বিষয় ও নির্ব্বিষয়-ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ কি? এবং উহার মধ্যে কোন্‌টা বড়?

স্বামীজী। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কাল বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেতো—কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্ত্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে আবার কেমন art develop (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! যাক্ এখন সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্ত্তনও প্রচার করে গেছেন। তারপর কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, একথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার জো নাই।

শিষ্য। মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

স্বামীজী। বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না; তখন শুদ্ধ 'অস্তি' এই মাত্র বোধ থাকে।

শিষ্য। মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন?

স্বামীজী। ওগুলি পূর্ব্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হতে যাচ্ছেন, তখন মারের অভ্যুদয় হল। মার বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, মনের প্রাক্‌সংস্কারই ছায়ারূপে বাহিরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য। তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তাহা কি মনঃকল্পিত?

স্বামীজী। তা নয় ত কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝতে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নাই। এই যে জগৎ দেখ্‌ছিস্, এটাও নাই। সকলি মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস-দর্শন হয়। "যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি" সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সঙ্কল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে পারে ও কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐ অবস্থা লাভ ক'রে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি লাভ ক'রে পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ 'শিব' 'শিব' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, "ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। 'সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'।"

নবম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ্চ ও এপ্রিল

স্বামীজীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত—মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন ও প্রশংসা—ভারতের স্ত্রীলোকদিগের অন্য দেশের সহিত তুলনায় বিশেষত্ব—স্ত্রীপুরুষ সকলকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য—সামাজিক কোন নিয়ম জোর করিয়া ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই, শিক্ষার প্রভাবে লোকে মন্দ নিয়মগুলি স্বতঃই ছাড়িয়া দিবে।

স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতে ঘুরিয়াও বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, "চল্—আমার সঙ্গে যাবি"—বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তিনি শিষ্য-সমভিব্যাহারে উঠিলেন; গাড়ী দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য। মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজী। চল্ না—দেখবি এখন।

এইরূপে কোথায় যাইতেছেন তদ্বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না বলিয়া গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া ক'রে মানুষ

হচ্ছিস কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি কচ্ছিস ?”

শিষ্য। কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল, কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি-এ পাস করিতেছে।

স্বামীজী। ও ত বিলাতি ঢং-এ হচ্ছে। তোদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে ? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তা আবার মেয়েদের ভিতর। গবর্ণমেণ্টের statistics-এ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent-ও (শতকরা একজন) হবে না।

তা না হলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হয় ? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে ? তোরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখেছিস —দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভিতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা আছে— কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হইবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু

দেশী ধরণে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (কাজ করবার যন্ত্র) করে তুলেছিস। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হল? মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (আপামর সাধারণকে) জাগাতে হবে, তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ী এইবার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "চোরবাগানের রাস্তায় চল্।" গাড়ী যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, মহাকালী পাঠশালার স্থাপনকর্ত্রী তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে

৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর কিছু পূর্ব্বদিকে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে দুই-চারি জন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 'শিবের ধ্যান' সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। পরে কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিবেন না বলিয়া স্কুলের দুই-তিনটি শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিলে তিনি একজন কুমারীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকল্পে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি ভগবতীজ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।"

বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজী স্কুলসম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বহিখানিতে (Visitors' Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজীও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্যের এখনও মনে আছে, তাহা এই—"The movement is in the right direction."

অনন্তর মাতাজীকে অভিবাদনান্তে স্বামীজী পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামীজী। এঁর (মাতাজীর) কোথায় জন্ম! —সর্ব্বস্ব ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হলো না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণী-গণের উপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্ব্বদা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গার্গী, খনা, লীলাবতীর মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কৈ!

স্বামীজী। দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নাই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর

কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরী কচ্ছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এঁদের উন্নতি করতে পারলি নে। এদের ভিতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলি নে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হতে পারে।

শিষ্য। মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে যে ভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে পারিলে, তবে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত।

স্বামীজী। ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখন জন্মায় নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতি-সূচক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখ লোক জড় করে চেঁচাতে লাগল "আমরা আইন চাই না।" —অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচান দূরে থাকুক লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক

ঘরে বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এহেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজী। কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য। এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে, তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্ম্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজী। অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশের ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কিরূপে? লেখা-পড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্য্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি কলিকাতায় অনেক স্থলে শাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজী। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কার্য্য হচ্ছে স্ত্রী, পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, সব বুঝতে পারবে ও আপনারা মন্দটা করা ছেড়ে দিবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গতে গড়তে হবে না।

শিষ্য। স্ত্রীলোকদিগের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ?

স্বামীজী। ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর-পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলিই মেয়েদের শিখান উচিত। নভেল নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রসকল ছাত্রীদের সামনে সর্ব্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা,

মীরা এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

গাড়ী এইবার বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে নূতনগঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে 'বিদ্যাদান' ও 'জ্ঞানদানের' শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "যেন পেহ্লাদের দলে যাস্ নি।" ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "শুনিস্ নি ? 'ক' অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল— তা আর পড়াশুনো কি করে হবে ? অবশ্য প্রহ্লাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল ও মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে। ভক্তদের ভিতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।" সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার যখন যে দিকে ঝোঁক উঠবে—তার একটা হেস্ত নেস্ত না হলে ত আর শান্তি নাই ; এখন যা ইচ্ছা হচ্ছে তাই হবে।"

দশম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীর শিষ্যকে ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করান—পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্বন্ধে স্বামীজীর অদ্ভুত বিশ্বাস—বেদমন্ত্রাবলম্বনে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা-রূপ বৈদিক মতের অর্থ—বেদ শব্দাত্মক—শব্দ পদের প্রাচীন অর্থ—নাদ হইতে শব্দের ও শব্দ হইতে স্থূল জগতের প্রকাশ সমাধিকালে প্রত্যক্ষ হয়—অবতারপুরুষদিগের সমাধিকালে ঐ বিষয় যেরূপে প্রতিভাত হয়—স্বামীজীর সহৃদয়তা—জ্ঞান ও প্রেমের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ-বিষয়ে শিষ্যের গিরিশ বাবুর সহিত কথোপকথন—গিরিশ বাবুর সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের অবিরোধী—গুরুভক্তিবলে গিরিশ বাবুর সত্য সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করা—না বুঝিয়া কেবলমাত্র কাহারও অনুকরণ করিতে যাওয়া দূষণীয়—ভক্ত ও জ্ঞানী দুই পৃথক্ ভূমি হইতে দেখিয়া বাক্য ব্যবহার করেন বলিয়া আপাতবিরুদ্ধ বোধ হয় —স্বামীজীর সেবাশ্রমস্থাপনের পরামর্শ।

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে ঋগ্বেদের সায়ন-ভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। Max Muller (মোক্ষমূলর)-এর মুদ্রিত বহুসংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ী হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে স্বামীজী সস্নেহে তাহাকে কখন কখন বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন; আবার

কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পরে স্বামীজী Max Muller-এর (মোক্ষমূলরের) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মনে হল কি জানিস্—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে Max Muller (মোক্ষমূলর)-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হইতেই ঐ ধারণা। Max Muller (মোক্ষমূলর)-কে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না; তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে। বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম—কি যত্নটাই করেছিল। বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত দুটিতে সংসার কচ্ছে! —আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়েছিল!"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি Max Muller (মোক্ষমূলর) হইয়া থাকেন ত পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেছ হইয়া জন্মিলেন কেন?

স্বামীজী। অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য্য, উনি ম্লেছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি? তাঁর কাছে ওসব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড

৬

গ্রন্থ ছাপবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিস্ নি? East India Company (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয় নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন দেখেছে? Max Muller (মোক্ষমূলর) নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript (হস্তলিপি) লিখেছেন; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কার্য্য নয়। ইহাতেই বোঝ্; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

মোক্ষমূলর সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্ত্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—সায়নের এই মত স্বামীজী সর্ব্বথা সমর্থন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন, আমাদের মতন সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা; —পৈতা-গলায় ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যাহা পরে

স্থূলাকার গ্রহণ করে আপনাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধারসাধন হল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরী হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও এইরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। একথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ পৃথিবীং দিবঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' বুঝ্‌লি?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈয়ারী হইবে?

স্বামীজী। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ্‌; এই ঘটটা ভেঙ্গে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐ সকল জিনিসের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টিভূত

ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ও উহারই প্রকৃত স্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূল রূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝ্লি?

শিষ্য। মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী। জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘটশব্দ থাকতে যে পারে, তা ত বুঝেছিস্? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙ্গে চুরে গেলেও তত্তদ্বোধাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করিলেই ত ঘট তৈয়ারী হয় না।

স্বামীজী। তুই আমি ঐরূপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটনঘটন হতে পারে— তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, বা গো, মানব, ঘট, পট ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক

একটা করে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝ্‌লি—শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল ?

শিষ্য। হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না।

স্বামীজী। ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে, শেষে নির্ব্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়। —তারপর তা-ও শুনা যায় না। —তা-ও আছে কি নাই এইরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। ব্যস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধিভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন,—নতুবা এমন বিশদভাবে এ সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন ? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা শুনা জিনিস না হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—"অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজ্যে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে 'ওঁ'কার অনুভব করেন, 'ওঁ'কার থেকে পরে

শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্ব্বশেষে স্থূল ভূতজগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকের কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—"ক্ষীরে নীরবৎ।"

এইসকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়'[১] এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু terminology-র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে উঠে!

এইবার গিরিশ বাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—"কি জি. সি., এসব ত কিছু পড়লে না—কেবল কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।"

গিরিশ বাবু। 'কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নাই, বুদ্ধিও নাই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের

১ ন্যায়প্রস্থানের গ্রন্থবিশেষ।

কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ওসব দরকার নাই', বলিয়া গিরিশ বাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়' !

পাঠককে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, স্বামীজী যখন যে বিষয়ে উপদেশ করিতেন, শ্রোতাদিগের মনে তদ্বিষয় তখন এত গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে, ঐ বিষয়কেই তাহারা ঐ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সার বস্তু বলিয়া অনুভব করিত। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যখন তিনি বলিতে থাকিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ তল্লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করিত। আবার ভক্তি বা কর্ম্ম বা জাতীয় উন্নতি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যখন তিনি প্রসঙ্গ উঠাইতেন, তখন তত্তদ্বিষয়কেই শ্রোতারা মনে মনে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিয়া তত্তদ্বিষয়ানুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। বর্ত্তমানে বেদের প্রসঙ্গ উঠাইয়া তিনি শিষ্য প্রভৃতির মন বেদোক্ত জ্ঞানের মহিমায় এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তখন উহাপেক্ষা সার এবং প্রয়োজনীয় বস্তু অন্য কিছু আর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গিরিশ বাবু তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলেন এবং স্বামীজীর মহদুদার ভাব ও শিক্ষাদানের ঐরূপ রীতির বিষয় ইতঃপূর্ব্বে পরিজ্ঞাত থাকায় শিষ্য প্রভৃতিকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাইয়া দিবার জন্য এখন মনে মনে এক যুক্তি স্থির করিলেন।

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশ বাবু বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-

বেদান্ত ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিন রাত ঘুরচে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নী—এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে—এ সকল রহিত করবার কোনও উপায় তোমার বেদে আছে কি?" গিরিশ বাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্য্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশ বাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি! চোখের সামনে দেখলি ত, মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশ বাবু। জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত।

শিষ্য। আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন; নিজে হৃদয়বান কি না! কিন্তু এইসব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশ বাবু। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই ত্যাখ্ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তিনটে একই জিনিস? এই ত্যাখ্ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শুনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ ক'রে থাকেন ত অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যই ত গিরিশ বাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।"

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?"

শিষ্য বলিল—"এই সব বেদের কথাই হইতেছে। ইনি এসকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

স্বামীজী। গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশ বাবুর) মত যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নাই। কিন্তু ওকে (গিরিশ বাবুকে) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অপরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। আজ্ঞে হাঁ নয়! যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি—মূর্খের মত সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও—বিশ্বাস করবি নি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্ব্বদা বলতেন। সদ্‌যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চল্‌বি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশ বাবু) বলিলেন, 'কি হবে ও-সব পড়ে ?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি ?

স্বামীজী। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই stand-point (বিভিন্ন দিক) থেকে আমাদের দুই জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্য্যন্ত। একটা অবস্থা আছে যেখানে যুক্তি-তর্ক সব চুপ হয়ে যায়—'মূকাস্বাদনবৎ।' আর একটা অবস্থা

আছে যাতে—বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা, পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসকল পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝ্লি ?

নির্ব্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশ বাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—"মহাশয়, শুনিলেন ত—স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।"

গিরিশ বাবু। তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্ব্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু কচ্ছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস ?

সদানন্দ। মহারাজ! যো হুকুম - বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী। প্রথমে ছোট-খাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে—যাদের কেউ দেখবার নেই এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি ?

সদানন্দ। যো হুকুম, মহারাজ!

স্বামীজী। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই। সেবাধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—"মুক্তিঃ করফলায়তে।"

এইবার গিরিশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"দেখ গিরিশ বাবু, মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় ত তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব উঠে?

গিরিশ বাবু। তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!

এই বলিয়া গিরিশ বাবু কার্য্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

একাদশ বল্লী

স্থান—আলমবাজার মঠ

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

মঠে স্বামীজীর নিকট হইতে কয়েক জনের সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণ—সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উপদেশ—ত্যাগই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্বত্যাগই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসগ্রহণের কালাকাল নাই, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—চারি প্রকার সন্ন্যাস—ভগবান বুদ্ধদেবের পর হইতেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের বৃদ্ধি—বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সন্ন্যাসাশ্রম থাকিলেও ত্যাগ-বৈরাগ্যই মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না—নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসিদল দেশের কোন কাজে আসে না ইত্যাদি যুক্তিখণ্ডন—যথার্থ সন্ন্যাসী নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত শেষে উপেক্ষা করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করেন।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময় স্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিষয় সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস অথবা আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভই হইতে পারে না; তাহাই কেবল নহে,—বহুজনহিতকর, বহুজনসুখকর কোন ঐহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্ব্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন; এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহিত করিতেন ও কৃপা করিতেন।

তাঁহার উৎসাহবাক্যে তখন কতিপয় ভাগ্যবান যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে যে চারিজনকে স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাঁহাদের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল। শিষ্যের মনে সেই দিন এখনও জাগরূক রহিয়াছে।

স্বামী নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীতে ইদানীং যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারাই ঐ দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মঠের সন্ন্যাসিগণের মুখে শিষ্য অনেকবার শুনিয়াছে যে, ইঁহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হলে কে আর দেখবে—তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।" স্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ কৃপাগুণে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "তুই ত ভট্‌চায্ বামুন; আগামীকল্য তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি, পরদিন এদের সন্ন্যাস দিব। আজ পাঁজি পুঁথি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস্।" শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বদিন সন্ন্যাসব্রত-ধারণে কৃতনিশ্চয় উক্ত ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, গঙ্গাস্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিধান

করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং স্বামীজীর স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন।

এখানে ইহা বলাও অত্যুক্তি হইবে না যে, শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধও ঐ সময়ে আপনি করিয়া লইতে হয়, কারণ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না। পুত্রপৌত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া সংসারের, এমন কি নিজ দেহের পূর্ব্ব সম্বন্ধাদি সঙ্কল্প দ্বারা নিঃশেষে বিলোপ-সাধন করিতে হয়। ইহাকে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিবাসক্রিয়া বলা যাইতে পারে। শিষ্য দেখিয়াছে, স্বামীজী এই সকল বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্ত্রমতে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহা বিরক্ত হইতেন। আজকাল যেমন গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেই অনেকে সন্ন্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করেন, স্বামীজী সেরূপ মনে করিতেন না। গুরুপরম্পরাগত আবহমানকাল প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যাসাধনোপযোগী সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের প্রাগনুষ্ঠেয় নৈষ্ঠিক সংস্কারগুলি ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইলেন। আমরা একথাও শুনিয়াছি যে, পরমহংসদেবের অপ্রকট হইবার পর স্বামীজী সন্ন্যাস লইবার বিধিবদ্ধ পদ্ধতি যে-সকল উপনিষদাদি শাস্ত্রে আছে, সে-সকল আনাইয়া স্বীয় গুরু-ভ্রাতৃগণের সঙ্গে একত্রে ঠাকুরের ছবির সমক্ষে বৈদিক মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলমবাজার মঠে উপর তলায় যে জলের ঘর ছিল, তাহাতে শ্রাদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আনীত হইয়াছে। স্বামী নিত্যানন্দ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধক্রিয়া অনেকবার করিয়াছিলেন; সুতরাং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাড়ের কোন ত্রুটি হয় নাই। শিষ্য স্নানান্তে স্বামীজীর আদেশে পৌরোহিত্যকার্য্যে ব্রতী হইল। মন্ত্রাদি যথাযথ পঠন-পাঠন হইতে লাগিল। স্বামীজী এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড নিজ নিজ পদে অর্পণ করিয়া আজ হইতে সংসার-সমক্ষে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেন, শিষ্য তখন নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয় হইল; সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হইল। পিণ্ডাদি লইয়া যখন ইঁহারা গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে ?" শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে। 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'।"

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল,—শাস্ত্রজ্ঞানাস্ফালন দূরীভূত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, কার্য্যে ও কথায় এত প্রভেদ !

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রতগ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ—ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।"

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম-বিষয়েই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুন্‌বি নি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোক-বাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে—এতটুকু কামনা যার রয়েছে—এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয় ; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়, 'একূল ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে'। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ—অশাস্ত্রীয়—অবৈদিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। গীতাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ'।"

"সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ইহা উহাতেই প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস—নয় অর্থের দাস—নয় মান, যশ, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়! যে যতই

কেন বলুক না, আমি বুঝেছি, এ সব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।”

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়?

স্বামীজী। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস—ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজী। সন্ন্যাসধর্ম্ম-সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বল্‌ছেন, ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ’—যখনি বৈরাগের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে। যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

‘যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।

কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।’

জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবকালেই ধর্ম্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায়।—(১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, (৩) মর্কট সন্ন্যাস, এবং (৪) আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হল ও তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে—এটি প্রাগ্‌জন্মসংস্কার না থাকলে হয় না। ইহারই নাম বিদ্বৎ সন্ন্যাস। আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে

শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হইবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন-ভজন করতে লাগল—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম মর্কট সন্ন্যাস। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, "বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তার পর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেললে।" আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে—যেমন—মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নাই, তখন তাকে সন্ন্যাস দিবার বিধি আছে। সে যদি মরে ত পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় ত আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী আতুর সন্ন্যাস দিয়েছিল। সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাসগ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়ান্তর নাই।

শিষ্য। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজী। সুকৃতিবশতঃ কোন না কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর

ধর্ম্ম পালন করেও দু-একটা মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ মহাশয়'!

শিষ্য। মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী। পাগলের মত কি বলছিস। বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস—ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই ত্যাগ বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম্ম absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে! ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায় নি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেবের জন্মাইবার পূর্ব্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজী। তা কে বললে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য বলে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্য-দার্ঢ্য ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" বলে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষে এই যে সব সন্ন্যাসীদের মঠ ফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ সব বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙ্গে রঙ্গিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই

যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালাস্থিতে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।" উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান বুদ্ধ তার ঢের আগে।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "তা হলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্ম্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকত; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা দেখা যায় না তখন তুমি কি করে বলবে বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক? দুই-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে—তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।

স্বামীজী। History (ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ। আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মের ভাবগুলি সজীব করে গেছেন মাত্র।

স্বামীজী। ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। Historyকে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মানলে একথা স্বীকার করতে হয় যে,

পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।

এইবার পুনরায় সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "সন্ন্যাসের origin (উৎপত্তি) যেখানেই হ'ক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে, এই ত্যাগব্রতাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাসগ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। যাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ে সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য। মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া ইহারা বলেন, 'উহারা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহকারী হন না।'

স্বামীজী। লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানেটা কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল দেখি।

শিষ্য। পাশ্চাত্ত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য, শিল্প, পোশাক-পরিচ্ছদ, রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজী। মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এসব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নাই! কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভিতরেই দেখেছি, রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে, এরাই ভারতের মেরুদণ্ড। যথার্থ

সন্ন্যাসী—গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্ব্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরিকার Indians-দের (আদিমনিবাসীদের) মত extinct (উজাড) হয়ে যেত। সন্ন্যাসীদের গৃহীরা দুমুটো খেতে দেয় বলে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্ম্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্ম্মের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শসকল তাদের জীবনে বা কার্য্যে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সকল ideas (উচ্চ ভাবসকল) নিয়েই গৃহীরা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাবসকল জীবনে পরিণত করছে ও ঠিক ঠিক কর্ম্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত করে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে তারা তাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাও আবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের স্নেহাশীর্ব্বাদেই দেশের লোকের বর্দ্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institution-এর (আশ্রমের) নিন্দা করে। অন্য দেশে যাই হ'ক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসার-সাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।

শিষ্য। মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয়জন দেখতে পাওয়া যায়?

স্বামীজী। হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন ত ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে নিয়ে চলবে। এই সন্ন্যাস institution (আশ্রম) দেশে ছিল বলেই ত তাঁর ন্যায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার কারণ কি?—যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হস্ ত তোদের ধিক—শত ধিক্।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মূর্ত্তিমান সন্ন্যাসরূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতে যেন অন্তর্ম্মুখ হইয়া আপনা আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য)

ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে—জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্র-বিয়োগ বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম, কি কচ্ছিস্ সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ্—নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে চলে যা—"উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

দ্বাদশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা—৺বলরাম বাবুর বাটী

বর্ষ—১৮৯৮

গুরুগোবিন্দ শিষ্যদিগকে কিরূপে দীক্ষা দিতেন—তিনি পাঞ্জাবের সর্ব্বসাধারণের মনে তৎকালে একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন—সিদ্ধাই-এর অপকারিতা—স্বামীজীর জীবনে পরিদৃষ্ট দুইটি অদ্ভুত ঘটনা—শিষ্যের প্রতি উপদেশ —ভূত ভাবতে ভাবতে ভূত হয়, এবং সদা 'আমি নিত্য মুক্ত বুদ্ধ আত্মা' এইরূপ ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা—প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামীজী ঐ বাড়ীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিতপূর্ব্ব ব্যক্তিগণকে পর্য্যন্ত দীক্ষাদান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্ম্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন—ওজস্বিনী ভাষায় তত্তদ্বিষয়ে কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ॥

অর্থাৎ—গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষা) শুনিয়া এক একজন ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তি সঞ্চারিত হইত। অর্থাৎ তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া গুরুগোবিন্দের প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্ম্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল। যখন যে বিষয়ে কথা পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয়াপেক্ষা বড় এবং তল্লাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, "মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।"

স্বামীজী। Common interest না হলে (এক প্রকারের স্বার্থচেষ্টা ভিতরে অনুভব না করলে) লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেক্চার করে সর্ব্বসাধারণকে কখনও

unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে। গুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেন নাই, কেবল উহা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহাশক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল।

অনন্তর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলেই সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিল।

স্বামীজী বলিলেন, "সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমেই লাভ করা যায়।" শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুই thought-reading (অপরের মনের কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখ্‌বি? চার-পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়ে দিতে পারি।"

শিষ্য। তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজী। কেন? পরের মনের ভাব জানতে পার্‌বি।

শিষ্য। তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজী। কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য। তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু

মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহার বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়।

। আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোনও পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম—গ্রামের কোনও লোকের উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। বাড়ীওয়ালার আগ্রহাতিশয়ে এবং নিজের curiosity (কৌতূহল) চরিতার্থ করতে ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, বহু লোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়া-চুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, ইহারই উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। দেখলুম, তার নিকটেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগান হচ্ছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোনও কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম। ইতোমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করযোড়ে আমার কাছে এসে বলল —'মহারাজ—আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন। আমি ত ভেবে অস্থির। কি করি, সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হল। গিয়েই কিন্তু অগ্রে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো

হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় ত অস্থির। থিওরী-মিওরী তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না বলে চিন্তায় ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হল না দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy!" (পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশাস্ত্র যার স্বপ্নেও সন্ধান পায় না!)

শিষ্য। পরে ঐ বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী। না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বললুম।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাইসকলের বড় নিন্দা করতেন। বলতেন, 'ঐসকল শক্তি-প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছান যায় না।' কিন্তু

মানুষের এমনই দুর্ব্বল মন, গৃহস্থের ত কথাই নাই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ-আনা লোক সিদ্ধাইয়ের উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকি দেখলে লোকে অবাক্ হয়ে যায়। সিদ্ধাই-লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধর্ম্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি। সে জন্য দেখিস্ নি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না ?"

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুয়ের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা 'বাঙ্গাল'কে বল না।"

শিষ্য ঐ বিষয় ইতঃপূর্ব্বে শুনে নাই। সুতরাং ঐ কথা বলিবার জন্য স্বামীজীকে জেদ্ করিয়া বসিল। স্বামীজী অগত্যা ঐ কথা তাহাকে এইরূপে বলিলেন—

"মান্দ্রাজে যখন মন্মথ বাবুর[১] বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম, মা (স্বামীজীর গর্ভধারিণী) মরে গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না—তা বাড়ীতে লেখা ত দূরের কথা। মন্মথ বাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলিকাতায় তার করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমায় আমেরিকায় যাবার যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মার শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথ বাবু বললেন যে শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস

১ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

করে—সে জীবের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ, সকল খবর বলে দিতে পারে। মন্মথ বাবুর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথ বাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলে করে গিয়ে পরে পায়ে হেঁটে সেখানে ত গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁট্‌কো ভূষ-কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' করে মান্দ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, উনিই পিশাচ-সিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা আমাদের সে ত আমলেই আনলে না। তার পর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল। আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তার পর একটা পেন্‌সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়ল। তার পর আগে আমার নাম, গোত্র, চৌদ্দপুরুষের খবর বললে; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন, এবং গর্ভধারিণী মার মঙ্গল-সমাচারও বললে! আর, ধর্ম্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে! এইরূপে মার মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্য্যের (মন্মথনাথ) সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলিকাতার তারেও মার মঙ্গলসংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 'কাক-তালীয়ের' ন্যায়ই হ'ক, বা যাই হ'ক।"

স্বামী যোগানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে এসব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার ঐসকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল!"

স্বামীজী। আমি কি না দেখে না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেল্‌কিই না দেখলুম! মায়া—মায়া!! রাম রাম! আজ কি ছাইভস্ম কথাই সব হল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর. যে দিনরাত জানতে অজানতে বলে—'আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তাত্মা', সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এইসব ছাইভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবি নি। কেবল সদসৎ বিচার করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণে যত্ন করবি; আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আর সবই মায়া—ভেল্‌কিবাজি! এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য। এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্যই তোদের বুঝাবার চেষ্টা করছি। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।"

কথা হইতে হইতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন—'কাল আসবি ত?'

শিষ্য। আজ্ঞে আসিব বৈ কি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছটফট্ করিতে থাকে।

স্বামীজী। তবে এখন আয়—রাত্রি হয়েছে।

অনন্তর শিষ্য স্বামীজীর কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি ১২টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়—ভাড়াটিয়া মঠ-বাড়ী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা—স্বামীজীর ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ভক্তগণকে যজ্ঞোপবীতপ্রদান—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের মঠে সমাদর—কর্ম্মযোগে বা পরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মদর্শন অবশ্যম্ভাবী—বিস্তৃত যুক্তির সহিত স্বামীজীর ঐ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া।

স্বামীজী যে বৎসর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসেন সেই বৎসর দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়। কিন্তু নানা কারণে পরবৎসর দক্ষিণেশ্বরে উৎসব বন্ধ হয়, এবং বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হয়। উহার কিছুদিন পরে বর্ত্তমান মঠের জমি খরিদ হইয়াছিল, তথাপি সে বৎসর জন্মোৎসব নূতন জমিতে হইতে পায় নাই। কারণ, তখনও মঠের জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং অনেক স্থলে সমতল ছিল না। তাই সেবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বেলুড়ে দাঁয়েদের ঠাকুর-বাড়ীতে হয়। ঐ উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ফাল্গুনী দ্বিতীয়া তিথিতে নীলাম্বর বাবুর বাগানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা হয়, এবং জন্মতিথিপূজার দুই-এক দিন পরেই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ইত্যাদি মঠের জন্য ক্রীত জমিতে লইয়া যাইয়া পূজা হোমাদি করিয়া তথায় ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্বামীজী তখন পূর্ব্বোক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল

আয়োজন। স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুর-ঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

জন্মতিথির সুপ্রভাতে সকলেই আনন্দিত। কেবল ঠাকুরের কথা ছাড়া ভক্তদের মুখে আর কোন কথাই নাই। পূজার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার পূজার আয়োজন দর্শন করিতে লাগিলেন।

পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "পৈতে এনেছিস্ ত ?"

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী। দ্বি-জাতিমাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা সব ব্রাত্য (পতিতসংস্কার) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। —বুঝলি ?

শিষ্য। আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

স্বামীজী। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এইরূপ গায়ত্রীমন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া দিলেন)

দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে ; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। ছোঁব না ছোঁব না বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শুনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।'— বুঝলি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান করে আসতে বল্। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পরবে।

স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শিষ্যের নিকট গায়ত্রীমন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থুল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষজ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল,

উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। ঐ সকল পরিয়া স্বামীজীর রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে! সেদিন যে-যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ কালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজীও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর চারিদিকে মূর্ত্তিমান ভৈরব-গণের ন্যায় অবস্থান করিয়া মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা বিস্তার করিলেন, সে দৃশ্য স্মরণ করিয়াও এখন আনন্দ হয়!

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া "কূজন্তং রামরামেতি" স্তবটি মধুরস্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল "রাম রাম শ্রীরাম রাম" এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামীজীর অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্দ্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোনও কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা! শিষ্য ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামীজী শিবভাবে মাতোয়ারা হইয়া রামনাম করিতেছেন! স্বামীজীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র-প্রান্তে যেন প্রভাত-সূর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ

টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে; অনুভূতির বিষয়। দর্শকগণ "চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে!"

রামনামকীর্ত্তনান্তে স্বামীজী পূর্ব্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামীজীর যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর সারদানন্দ স্বামীকে গাহিতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ "একরূপ অরূপ নাম বরণ" গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশ বাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশ বাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার'। আমাদের সঙ্গে এঁর কোনও প্রভেদ নেই।" গিরিশ বাবু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশ বাবুকে পরান হইল। গিরিশ বাবু কোনও আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায়

তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন—"জি. সি.,[১] তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (রামকৃষ্ণদেবের) কথা শুনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বস্।" গিরিশ বাবুর তখনও মুখে কোনও কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা-দর্শনে ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ-দর্শনে তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশ বাবু বলিলেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলব? কামকাঞ্চনত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসতে অধিকার দিয়েছেন এতেই তাঁর অপার করুণা অনুভব করি।" কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাহিলেন। "বৈঁইয়া না পাকাড়ো মেরা নরম কহলাইয়া" ইত্যাদি। শিষ্য সঙ্গীতবিদ্যায় একেবারে পণ্ডিত, তাই ঐসকল গানের এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না; কেবল স্বামীজীর মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজী নীচের বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"তোরা হচ্ছিস্ দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছ্লি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি।

[১] গিরিশ বাবুকে স্বামীজী 'জি. সি' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রত্যহ গায়ত্রীমন্ত্র অন্ততঃ এক শত বার জপ্‌বি, বুঝলি?” গৃহস্থটি ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া নানা সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র বাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী বারংবার বসিতে বলায় জড়সড় ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজী। মাষ্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শুনাতে হবে।

মাষ্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মন ওজনের দুইটি পানতুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পানতুয়া দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখান হইলে পর স্বামীজী বলিলেন—“ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যা।”

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—“দেখ্‌ছিস্ কেমন কর্ম্মবীর! ভয় মৃত্যু—এ সবের জ্ঞান নেই;—এক রোখে কর্ম্ম করে যাচ্ছে—‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’।”

শিষ্য। মহাশয়, কত তপস্যার বলে উঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে!

স্বামীজী। তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম্ম করলেই তপস্যা করা হয়। কর্ম্মযোগীরা কর্ম্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী

হয়ে সাধককে কর্ম্ম করায়, তেমন আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন—যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে?

স্বামীজী। তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্ম্মও সেইরূপ। সুতরাং যারা পরিহিতে কার্য্য করে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নাই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, করে যা; আর একজনের কর্ম্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস্—কর্ম্মটা আর তপস্যা নয়?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, পূর্ব্বে তপস্যা অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজী। যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে তাতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাইতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝ্‌লি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ্‌না, তপস্যার ফল লাভ হয় কি না। পরার্থ কর্ম্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙ্গে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি ?

স্বামীজী। নিজহিতের জন্য। এই দেহটা, যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস্, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এইরূপে কর্ম্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্বজীবে সর্ব্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি, এক প্রকারের ঈশ্বরসাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সাধন দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিন রাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে ?

স্বামীজী। আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার, সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে, ঐ কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, সর্ব্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস্ ত আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মত—হয়ে বসে থাকা ?

শিষ্য। তাহা না হইলেও সর্ব্ব বৃত্তি ও কর্ম্মের নিরোধকেই ত শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন ?

স্বামীজী। শাস্ত্রে যাকে সমাধি বলা হইয়াছে, সে অবস্থা ত আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল? সেজন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য। তবেই ত এ কথা দাঁড়াইতেছে, মহাশয়, যে জীবন্মুক্তি-অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী। শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্ম্মযোগ' বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন—

দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥[১]

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত।

গিরিশ বাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। "তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে" —পদটি বার বার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর "মজল আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে," "অগণন ভুবনভারধারী" ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ বল্লী

স্থান—বেলুড় ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

নূতন মঠের জমিতে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা—আচার্য্য শঙ্করের অনুদারতা—বৌদ্ধধর্ম্মের পতন-কারণ-নির্দ্দেশ—তীর্থমাহাত্ম্য—'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' শ্লোকার্থ—ভাবাভাবের অতীত ঈশ্বর-স্বরূপের উপাসনা।

আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্ব্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব্ব দর্শন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুরঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজী শিষ্যকে

বলিলেন—"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব—তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

শিষ্য। ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছিলেন ?

স্বামীজী। (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মুখে শুনিস নি ? —কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য। ওঃ ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল ?

স্বামীজী। হাঁ, 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপালাভ করেছেন—তা গেরস্থই হন আর সন্ন্যাসীই হন—তাঁদের ভিতর দলফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস্ ? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙ্গে রঙ্গিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙ্গিন কাচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্য্যকে নানারংবিশিষ্ট বলে দেখছি। অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎসম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎকালে ঐরূপ 'দলফল' সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোখ ঝল্‌সে যায়

অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি সব ভেসে যায়। কাজেই 'দলফল' করবার তাদের অবসর হয় না। কেবল যে যার নিজের ভাবে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন ও সেইজন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া বসে?

স্বামীজী। হাঁ, এ জন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দ্যাখ্ না, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু ঐসকল সম্প্রদায়ই চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।

শিষ্য। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় দাঁড়াইবে?

স্বামীজী। হবে বই কি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাপ্রদানও করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।” সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—“ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নাই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) নিয়ে চল্।” শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—“ভয় নাই, কর, আমার আজ্ঞা।” শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটামস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন—“ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্ব্বাদ করছেন। সাবধান, আজ হতে আর

কোনও অনিত্য বিষয়ে মন দিস্ নে।" একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্ব্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন—"দেখিস্, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।"

এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে মঠে উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস্? —এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা ইহার চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ী করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাক্‌বে। আর, মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাক্‌বার ঘর-দোর হবে। এরূপ হলে কেমন হয় বল্ দেখি?"

শিষ্য। মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।

স্বামীজী। কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমি ত পত্তনমাত্র করে দিচ্ছি—এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব। আর তোদের ভিতর নানা idea (মতলব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বড় বড় principle (মীমাংসা) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝ্‌তে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝ্‌লি? একেই বলে practical religion (কর্ম্মজীবনে পরিণত ধর্ম্ম)।

এইরূপে নানা প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাহাকে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতকে সে সর্ব্বদর্শনের মুকুটমণি বলিয়া জ্ঞান করিত এবং শ্রীশঙ্করের কোনও কথায় কেহ কোনরূপ দোষার্পণ করিলে তাহার হৃদয় যেন সর্পদষ্ট হইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোনও মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজী। শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল বলে বোধ হয়। আবার, ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটি দক্ষিণী ভট্টাচার্য্য গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, এ কথা বেদান্তভাষ্যে কেমন সমর্থন করে গেছেন! বলিহারি বিচার! বিদুরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—তার পূর্ব্বজন্মের ব্রাহ্মণশরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি ঐরূপ কোনও শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বল্‌তে হবে যে সে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে কাজ কিরে বাবা? বেদ ত ত্রৈবর্ণিকমাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই

অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশের কোনও প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হৃদয় যে কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন— তাদের তর্কে হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কি না তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের ঐরূপ কার্য্যকে fanaticism (সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির উত্তেজনাপ্রসূত পাগলামি) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু দেখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজজীবন দান করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত! দেখ্ দেখি কি উদারতা—কি দয়া!

শিষ্য। বুদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য কোন প্রকারের পাগলামি বলা যাইতে পারে না? একটা পশুর জন্য কি না নিজের গলা দিতে গেলেন!

স্বামীজী। কিন্তু তাঁর ঐ fanaticism-এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হল—তা দেখ্; কত আশ্রম, স্কুল, কত কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হল, তা ভেবে দেখ্! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে ছিল কি?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলা ধর্ম্মতত্ত্ব—তা-ও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ আনলেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্ত্তি!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতে হিন্দু-

ধর্ম্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম ভারত হইতে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। বৌদ্ধধর্ম্মের ঐরূপ দুর্দ্দশা তাঁর teaching-এর (শিক্ষার) দোষে হয় নাই, তাঁর follower-দের (চেলাদের) দোষেই হয়েছিল; বেশী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চ্চা করে) তাদের heart-এর (হৃদয়ের) উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোনও তন্ত্রে নাই! বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগন্নাথক্ষেত্র'—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্ত্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জানতে পার্‌বি। রামানুজ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রটা বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐসকল মহাপুরুষদের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য ?

স্বামীজী। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থানমাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থান-বিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুলাগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐসকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এই জন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে।

তবে স্থির জানবি, এই মানবদেহের চেয়ে আর কোনও প্রধান তীর্থ নাই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ এমন আর কোথাও নাই। ঐ যে জগন্নাথের রথ তা-ও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস্ না—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি, "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে"—এই বামনরূপী আত্মদর্শনই ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে, "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—এর মানে হচ্ছে, তোর ভিতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা করে তুই কিম্ভূত-কিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্ব্বদা 'আমি' বলে ধরে নিচ্ছিস্, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হত, তা হলে বছরে বছরে কোটী জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ! তবে ৺জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্ত্তি-অবলম্বনে উচ্চ হতে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়, অতএব ঐ মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম আলাদা?

স্বামীজী। তাই ত, নইলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকার-নির্দ্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই truth, তবে relative truth different in degrees. মানুষ যা কিছু সত্য বলে

জানে, সে-সকলই ঐরূপ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান। এই আত্মা জড়ের ভিতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, জীবনামধারী মানুষের ভিতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগরিত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই superconscious stage-এ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'।

শিষ্য। মহাশয়, কোনও কোনও ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে—'ঐ সকল কথা ছাড়িয়া সর্ব্বদা ভাবে থাক।'

স্বামীজী। তারা যা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ করতে করতে তাদের ভিতরও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠবেন। আমরা (সন্ন্যাসীরা) যা করছি, তা-ও আর এক রকম ভাব। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির মত কোনও একটা ভাব ভগবানে আরোপ করে সাধনা করা—আমাদের ভাব কেমন করে হবে? ওসব আমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য, সর্ব্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না বলে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্ব্বদা বলবি, শুনবি, বিচার করবি। ঐরূপ করতে করতে কালে দেখবি—তোর ভিতরেও সিঙ্গি (ব্রহ্ম) জেগে উঠবেন। ঐ

সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বলেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামি-সমভিব্যাহারে শিষ্যও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল।

পঞ্চদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী মাস

স্বামীজীর বাল্য ও যৌবনের কয়েকটি কথা ও দর্শন—আমেরিকায় প্রকাশিত বিভূতির কথা—ভিতরে বক্তৃতার রাশি কে যেন ঠেলিয়া দিতেছে, এইরূপ অনুভূতি—আমেরিকায় স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ—পাদরীদের ঈর্ষ্যাপ্রসূত অত্যাচার—চালাকি করিয়া জগতে মহৎ কাজ করা যায় না—ঈশ্বর-নির্ভর—নাগ মহাশয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বেলুড়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন। আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিসপত্র এখনও সব গুছান হয় নাই। ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজী নূতন বাড়ীতে আসিয়া খুব খুশি হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, "দেখ্ দেখি কেমন গঙ্গা—কেমন বাড়ী! এমন স্থানে মঠ না হলে কি ভাল লাগে?" তখন অপরাহ্ন।

সন্ধ্যার পর শিষ্য স্বামীজীর সহিত দোতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেহই নাই; শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নৈলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণগান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট যেখানে রামায়ণগান হইত, স্বামীজী খেলাধুলা

ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। বলিতেন—রামায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া তিনি বাড়ীঘর ভুলিয়া যাইতেন এবং 'রাত হইয়াছে' বা 'বাড়ী যাইতে হইবে' ইত্যাদি কোনও বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। একদিন রামায়ণ-গানে শুনিলেন—হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল যে, সে রাত্রি রামায়ণ-গান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া বাড়ীর নিকটে কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হনুমানের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হনুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন এবং অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন।

পাঠ্যাবস্থায় দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদিগের সহিত কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। কখন যে তিনি পড়াশুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

* * *

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মহাশয়, স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ vision দেখিতেন কি?"

স্বামীজী। স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ করে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করছিলাম, বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হল—তখনও বসে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে

এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোনও ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসিমূর্ত্তি। মুণ্ডিতমস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। যেন আমায় কিছু বলবেন, এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল—তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। তারপর মনে হল, কেন এমন নির্ব্বোধের মত ভয়ে পালালুম, হয় ত তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্ত্তির কখনও দেখা পাই নি। কতদিন মনে হয়েছে যদি তাঁর ফের দেখা পাই ত এবার আর ভয় করব না—তাঁর সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর দেখা পাই নি।

শিষ্য। তারপর এ বিষয় কিছু ভেবেছিলেন কি ?

স্বামীজী। ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাই নি। এখন বোধ হয় ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

কিছুক্ষণ বাদে স্বামীজী বলিলেন, "মন শুদ্ধ হলে, কাম-কাঞ্চনে বীতস্পৃহ হলে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভুত অদ্ভুত ! তবে ওতে খেয়াল রাখতে নেই। ঐসকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। শুনিস্ নি, ঠাকুর বলতেন—'কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে !' আত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে হবে—ওসব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে ?"

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তন্ময় হইয়া কোনও বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"দেখ্, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার

কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝতে পারতুম—মুহূর্ত্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আস্‌ত, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

"যখন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা, কখনও আরও বেশী লেক্‌চার দিতে হত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহাক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগল। ভাবতুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা বলব? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি—তাই ত, এখন কি উপায় করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মত এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কচ্ছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে-সব যেন ইহজন্মে শুনি নি, ভাবিও নি! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ করে রাখলুম, আর বক্তৃতায় তাই বললুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি! কখনও বা এত জোরে জোরে বক্তৃতা হত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত—'স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কচ্ছিলেন?' আমি তাদের সে কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!"

শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল—"মহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থূলদেহে কখনও কখনও তার প্রতিধ্বনি বাহির হইত।"

শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন—"তা হবে।"

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, "সে দেশের পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিতা। বিজ্ঞান-দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিত; তাই তারা আমায় অত খাতির করত। পুরুষগুলো দিনরাত খাটছে, বিশ্রামের সময় নেই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করে মহাবিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের রাজত্ব।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামীজী। হয়েছিল বই কি। আবার যখন লোকে আমায় খাতির করতে লাগল, তখন পাদরীরা আমার পেছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য হয় না; তাই ঐসকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে contradict (প্রতিবাদ) করে ক্ষমা চাইত। কখনও

কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐসকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ী-ওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভোঁ—কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস্ বাবা, সংসার সবই তুনিয়া-দারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব তুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোনও মহৎ কার্য্য করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস্ না?—

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥"

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক, যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্ নি। কত বড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায়! যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষেমেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই সমুদ্রের

তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে? যা হবার হোক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে করবই করব—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবেও তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে না।

শিষ্য। তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্ব্বলতার চিহ্ন?

স্বামীজী। শাস্ত্র নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে দৈব দৈব করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন—মহাকাপুরুষতার পরিণাম; কিম্ভূতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাপানোর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যাপাপের গল্প শুনেছিস্ ত? সেই গোহত্যাপাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভুগে মরতে হল। আজকাল সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলে পাপ-পুণ্য দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রের জল! সর্ব্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে ত মুক্ত! কিন্তু ভালর বেলা 'আমি', আর মন্দের সময় 'তুমি'—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতায়! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের ভিতর) ইদানীং নাগ মহাশয়।

বলিতে বলিতে নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটি দেখা যায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!"

শিষ্য। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা-ঠাক্রুণ (নাগ মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।

স্বামীজী। ঠাকুর তাঁকে জনক রাজার সহিত তুলনা করতেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথা শুনাও যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। তিনি ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য। মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজী। অমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাকলে তবে ওসব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ মহাশয় বাড়ীতে কিরূপ থাকেন?

শিষ্য। মহাশয়, কাজকর্ম্ম ত কিছুই দেখি না। কেবল অতিথি-সেবা লইয়াই আছেন; পাল বাবুরা যে কয়েকটি টাকা দেন তদ্ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য সম্বল নাই; কিন্তু খরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়ীতে যেমন হয় তেমনি! কিন্তু নিজের ভোগের জন্য সিকি পয়সাও ব্যয় নাই—অতটা ব্যয় সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা—সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি অভিন্ন-জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্য নিজের জীবনটাকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁশ। বাস্তবিক শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কি না,

সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (জ্ঞানাতীত) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় অবস্থান করেন।

স্বামীজী। তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তোদের বাঙ্গাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ব্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

ষোড়শ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস

কাশ্মীরে ৺অমরনাথ-দর্শন—৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দেবীর বাণী-শ্রবণ ও মন হইতে সকল সংকল্পত্যাগ—প্রেতযোনির অস্তিত্ব—ভূতপ্রেত দেখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখা অনুচিত—স্বামীজীর প্রেতদর্শন এবং শ্রাদ্ধ ও সংকল্প দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করা।

স্বামীজী আজ দুই-তিন দিন হইল কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিলেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কাশ্মীর হতে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কন্ না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস্।"

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিল—স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, বোস্।"—এই পর্য্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রাভ্যন্তরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?" স্বামীজী "ও কিছু না" বলিয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, "৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা

সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (জ্ঞানাতীত) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় অবস্থান করেন।

স্বামীজী। তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তোদের বাঙ্গাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ব্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

ষোড়শ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস

কাশ্মীরে ৺অমরনাথ-দর্শন—৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দেবীর বাণী-শ্রবণ ও মন হইতে সকল সংকল্পত্যাগ—প্রেতযোনির অস্তিত্ব—ভূতপ্রেত দেখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখা অনুচিত—স্বামীজীর প্রেতদর্শন এবং শ্রাদ্ধ ও সংকল্প দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করা।

স্বামীজী আজ দুই-তিন দিন হইল কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিলেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কাশ্মীর হতে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কন্ না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস্।"

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিল—স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, বোস্।"—এই পর্য্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রাভ্যন্তরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?" স্বামীজী "ও কিছু না" বলিয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, "৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা

আমাকে বলিবেন না?" পাদস্পর্শে স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙ্গিল, যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল। বলিলেন, "অমরনাথ-দর্শনের পর হতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।" শিষ্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

স্বামীজী। ৺অমরনাথ ও পরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম। যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একটা খাড়া চড়াই ভেঙ্গে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হল, ঐ পথেই যাব। যাব ত যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কন্‌কনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।"

শিষ্য। শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে ৺অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়, কথাটা কি সত্য?

স্বামীজী। হাঁ; আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলুম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারি নি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য। পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন জীবজন্তুকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে।

স্বামীজী। হাঁ, ৩।৪ টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝতে পারলুম না।

শিষ্য। মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি, গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া যদি সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় সত্যসত্য শিবদর্শন হইল।

স্বামীজী বলিলেন, "শুনেছি পায়রা দেখলে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।"

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, আসিবার কালে তিনি সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অল্পদিন পরেই ৺ক্ষীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাত দিন তথায় অবস্থান করিয়া ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ১/০ মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীজীর মনে উঠিয়াছিল, "মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির পুরাকালে ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না"—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, "আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস্? তোকে আমি রক্ষা

করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি?" স্বামীজী বলিলেন, "ঐ দৈববাণী শুনা অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।" শিষ্য অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, "যা কিছু দেখিস্ শুনিস্ তা তোর ভিতরে অবস্থিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছুই নাই।"—স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, "মহাশয়, আপনি ত বলিতেন এইসকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনি মাত্র।" স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা ভিতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মত ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস্, তা হলে কি মিথ্যা বলতে পারিস্? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে—তেমনি!"

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইল; কারণ স্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না—যুক্তিতর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত!

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, "মহাশয়, এই যে ভূতপ্রেতাদি যোনির কথা শুনা যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে?"

স্বামীজী। সত্য বই কি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত অযুতাযুত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পাস্ না বলে তাদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে ঐসব ভুতুড়ে কাণ্ডে মন দিস্ নে,

ভাব্‌বি ভূত-প্রেত আছে ত আছে। তোর কার্য্য হচ্ছে—এই শরীরমধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে হয় উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্মাদি-বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না।

স্বামীজী। তোরা ত মহাবীর; তোরা আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়লি—এই বিরাট বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জানলি—এতেও কি আত্মজ্ঞানলাভ ভূতপ্রেত দেখে করতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কখন দেখিয়াছেন কি?

স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সংসারসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখন কখন দূর দূরের সংবাদসকলও আনিয়া দিত। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থ-বিশেষে যাইয়া "সে মুক্ত হয়ে যাক্"—এইরূপ প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

শিষ্য এইবার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কি না প্রশ্ন করিলে স্বামীজী কহিলেন, "উহা কিছু অসম্ভব নয়।" শিষ্য ঐ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে স্বামীজী কহিলেন, "তোকে একদিন

ঐ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য একদিন উহা বুঝিয়ে দেব।" শিষ্য কিন্তু এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

সপ্তদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস

স্বামীজীর সংস্কৃতরচনা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে ভাব ও ভাষায় প্রাণসঞ্চার—ভাষাতে ওজস্বিতা কি ভাবে আনিতে হইবে—ভয় ত্যাগ করিতে হইবে—ভয় হইতেই দুর্ব্বলতা ও পাপের প্রসার—সকল অবস্থায় অবিচল থাকা—শাস্ত্রপাঠের উপকারিতা—স্বামীজীর অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি-পাঠ—জ্ঞানের উদয়ে কোন বিষয়কেই আর অদ্ভুত মনে হয় না।

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ'[১] ইত্যাদি শ্লোক দুইটি তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং ঋতং'[২] ইত্যাদি স্তবটি রচনা করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখিস্, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কি না।" শিষ্য স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

১ 'বীরবাণী' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২ এই ঘটনার চার-পাঁচ দিন পরে স্বামীজী একদিন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "সে স্তবটার কোনরূপ সংশোধন-দরকার দেখলি কি?" তদুত্তরে শিষ্য বলে যে, সে তখনও উহা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখে নাই। পরে ঐ স্তবের মূল কপি মঠে অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া না যাওয়ায় 'ওঁ হ্রীং ঋতং' স্তবটি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শিষ্যের নিকটে যে কপিখানি ছিল, তাহাই স্বামীজীর স্বস্বরূপ-সম্বরণের প্রায় চারি বৎসর পর শিষ্যের পুরাতন কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়েই উহা 'উদ্বোধনে' প্রথম ছাপা হয়।

স্বামীজী যে দিন ঐ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন স্বামীজীর জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস শিষ্য মহা মহা পণ্ডিতের মুখেও কখন শুনে নাই।

সে যাহা হউক, শিষ্য স্তবটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, "দেখ্, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে শুনে দিতে।"

শিষ্য। মহাশয়, ওসব স্খলন নয়—উহা আর্ষ প্রয়োগ।

স্বামীজী। তুই ত বললি; কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন? এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম্ম কি?' বলে একটা বাঙ্গালায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙ্গালা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের ন্যায় ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ্ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙ্গে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও করচে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না, আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি! এখন এসব সন্ন্যাসীদের দূরদূরান্তরে প্রচারকার্য্যে যেতে হবে—ছাইমাখা, অর্দ্ধ-উলঙ্গ

প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম ত জাহাজেই নেবে না; ঐরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে পঁহুছিলেও তাকে কারাগারে অবস্থান করতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়োপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্ত্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়ত তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক—তবু বাঙ্গালা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙ্গালা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি। ভাষার ভিতর verbগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস্?—ঐরূপে ভাবের pause বা বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মত দুর্ব্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয় যেন ভাষার দম নেই। সেজন্যই বাঙ্গালা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) করা যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ

প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অনেক কাল হইতে এদেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্ত্তন করা কি শীঘ্র সম্ভব?

স্বামীজী। তুই যদি পুরান চালটা খারাপ বুঝে থাকিস্ ত যেমন বললুম নূতন ভাবে চলতে শেখ্ না। তোর দেখাদেখি আরো দশজনে তাই করবে; তাদের দেখে আরো ৫০ জনে শিখবে—এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভিতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠবে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কাজ না করিস্ তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাজের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়—উৎসাহ, বল ও তেজে হৃদয় ভরিয়া যায়।

স্বামীজী। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা 'মানুষ' যদি তৈরী হয়, ত লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক করে idea (ভাব)-গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন 'ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।' সব দিকে practical হতে (কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মতের বা ভাবের বিকাশ দেখাতে) হবে। Theoryতে theoryতে (মতে মতে) দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্ম্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত

করবার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে কাজ করে যাবে। তুলসীদাসের দোঁহায় আছে শুনিস্ নি—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক্। তাদের ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পারা যায় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—শরীরে, মনে বল না থাকলে এই আত্মা লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে ত মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর করবি। "আমি হীন, আমি হীন" বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে যায়; শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

—যার 'মুক্ত'-অভিমান সর্ব্বদা জাগরূক সেই মুক্ত হয়ে যায়, যে ভাবে 'আমি বদ্ধ', জানবি জন্মে জন্মে তার বন্ধনদশা। ঐহিক পারমার্থিক উভয় পক্ষে ঐ কথা সত্য জানবি। ইহজীবনে যারা সর্ব্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ করতে করতে আসে ও যায়। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, একথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্ব্বদা বল্ 'অভীঃ' 'অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই

নরক, ভয়ই অধর্ম্ম, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (অসৎ বা মিথ্যা ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ সয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডির বাহিরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শূন্য হবেন—সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—'অভীঃ, অভীঃ'।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন 'অভীঃ' মূর্ত্তিমান হইয়া স্বামিরূপে শিষ্যের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য সেই অভয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষের কাছে থাকিলে এবং কথা শুনিলে মৃত্যুভয়ও যেন কোথায় পলায়ন করে!

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই দেহধারণ করে কত সুখে দুঃখে—কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও সব মুহূর্ত্তকালস্থায়ী। ঐ সকলকে গ্রাহ্যের ভেতর আনবি নি, 'আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা'—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। 'আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা'—এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ-কষ্টের সময় আপনা আপনি ঐ ভাব মনে উঠে পড়বে—চেষ্টা করে

আর আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুয্যের বাড়ী গিয়েছিলুম,[১] সেখানে এমন হাঁপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভিতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগল—'সোঽহং সোঽহং'; বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম আর দেখছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে 'সোঽহং সোঽহং'—কেবল শুনতে লাগলুম 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন!'

শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অনুভূতিসকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় না।"

স্বামীজী। না রে! শাস্ত্রও পড়তে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠ একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class (ক্লাস) খুলচি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত পড়া হবে। অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।

শিষ্য। আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন?

স্বামীজী। যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "স্বামীজী! তিন দিনেও

---

১ স্বামীজী এক সময় বায়ুপরিবর্তনের জন্য বৈদ্যনাথে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়াছিলেন।

আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম্ম বুঝাতে পারলুম না! আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।" ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভর্ৎসনা এল। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্র-ভাষ্যের অর্থ যেন 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, "আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এরূপ চমৎকার ব্যাখ্যা কিরূপে উদ্ধার করলেন?" তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরু চূর্ণ করতে পারা যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সবই অদ্ভুত!

স্বামীজী। অদ্ভুত বলে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানা-লোকে সব উদ্ভিন্ন হলে কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, তাও লুকিয়ে যায়! যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান্—তাঁর কথা ভাব্—সে আত্মা প্রত্যক্ষ হলে শাস্ত্রার্থ 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই পুনরায় অপরের জীবনেও সিদ্ধ হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা

সর্ব্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মাকে বিকাশ করবার চেষ্টা কর্। দেখবি বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি এক-দেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হলে দেখবি দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহ-গর্জ্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্, জীবকে অভয় দিয়ে বল্—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—Arise! awake! and stop not till the goal is reached.

অষ্টাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীর নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা—ঐ সমাধি হইতে কাহারা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম—অবতারপুরুষদিগের অদ্ভুত শক্তির কথা ও তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ—শিষ্যের স্বামীজীকে পূজা।

শিষ্য আজ দুদিন হইল বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে স্বামীজীর কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল চির-উৎসব। কত ধর্ম্মচর্চ্চা—কত সাধনভজনের উদ্যম—কত দীন-দুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে! সন্ন্যাসী মহারাজগণ সকলেই মহা উৎসাহী—মহাদেবের গণরূপে স্বামীজীর আজ্ঞাপালনে উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মঠে পূজা ও প্রসাদের বিপুল আয়োজন—সমাগত ভদ্রলোকদের জন্য সর্ব্বদা প্রসাদ প্রস্তুত।

আজ স্বামীজী শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। স্বামীজীর সেবাধিকার পাইয়া শিষ্যের হৃদয়ে আজ আর আনন্দ ধরে না! প্রসাদগ্রহণান্তে সে স্বামীজীর পদসেবা করিতেছে, এমন সময় স্বামীজী বলিলেন, "এমন জায়গা ছেড়ে তুই কি না কলকাতায় যেতে চাস্—এখানে কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার হাওয়া, কেমন সব সাধুর সমাগম! এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি?"

শিষ্য। মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে। এখন যাহাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দেন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়।

স্বামীজী। আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, দেশ, কাল, আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গেছ্‌লুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল, জল, আর কিছুই নেই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌" কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 'আমি ব্রহ্ম' একথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদার্থ পৃথক্‌ থাকে—দ্বৈতভান থাকে। তারপর ঐরূপ অবস্থালাভের জন্য বারম্বার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বললেন—"দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাজ হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাজ করা শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।"

শিষ্য। নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে তবে কি কেহই আর পুনরায় 'অহং'-জ্ঞান আশ্রয় করিয়া দ্বৈতভাবের রাজত্বে, সংসারে ফিরিতে পারে না?

স্বামীজী। ঠাকুর বলতেন, "একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতকামে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিনমাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মত সংসাররূপ বৃক্ষ হতে খসে পড়ে যায়।"

শিষ্য। মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়—মনের কোন তরঙ্গই যখন আর থাকে না, তখন আবার বিক্ষেপের—আবার 'অহং'-জ্ঞান লইয়া সংসারে ফিরিবার সম্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে, কি নিমিত্তই বা সমাধি-অবস্থা ছাড়িয়া দ্বৈত্যরাজ্যে নামিয়া আসিবে?

স্বামীজী। বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। কিন্তু অবতারেরা এক-আধটা সামান্য বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার superconscious state থেকে conscious state-এ (জ্ঞানাতীত অদ্বৈতভূমি থেকে 'আমি-তুমি'-জ্ঞানমূলক দ্বৈতভূমিতে) আসেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে নিঃশেষ নিরোধ সমাধি বলি কিরূপে? কারণ, শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বামীজী। মহাপ্রলয়ের পরে তবে স্থষ্টিই বা আবার কেমন করে হবে? মহাপ্রলয়েও ত সব ব্রহ্মে মিশে যায়? তার পরেও কিন্তু আবার শাস্ত্রমুখে স্থষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—স্থষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে স্থষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্ত্তনের ন্যায় অবতারপুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুত্থানও তদ্রূপ অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে?

শিষ্য। আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃস্থষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিন্তু স্থষ্টির বীজ ও শক্তির (আপনি যেমন বলেন) potential (অব্যক্ত) আকারধারণ মাত্র?

স্বামীজী। তা হলে আমি বলব, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নেই—যা নির্লেপ ও নিগুর্ণ—তাঁর দ্বারা এই স্থষ্টিই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভবে, তার জবাব দে।

শিষ্য। এ ত seeming projection! সে কথার উত্তরে ত শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে স্থষ্টির বিকাশটা মরুমরীচিকার মত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ স্থষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। ভাব-বস্তু ব্রহ্মের অভাব বা মিথ্যা মায়াশক্তিবশতঃ এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে।

স্বামীজী। স্থষ্টিটাই যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নির্ব্বিকল্প-সমাধি ও সমাধি হইতে ব্যুত্থানটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস্ ত? জীব স্বতঃই ব্রহ্মস্বরূপ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে 'আমি আত্মা' এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হলে ভ্রম, কারণ শাস্ত্র বলছে,

You are already that (তুই সর্ব্বদা ব্রহ্মই যে হয়ে রয়েছিস)। অতএব "অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি" —তুই যে সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিস, এটাই তোর বন্ধন।

শিষ্য। এ ত বড় মুশকিলের কথা; আমি যদি ব্রহ্মই, তবে ঐ বিষয়ের সর্ব্বদা অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজী। Conscious plane-এ ('তুমি-আমি'র রাজত্ব দ্বৈত-ভূমিতে) ঐ কথা অনুভূতি করতে হলে একটা করণ বা যাহা দ্বারা অনুভব করবি, তা একটা চাই (some instrumentality)। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা ত জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনটা চেতনের মত প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন— "চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা'—চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্বের আবেশেই শক্তিকে চৈতন্যময়ী বলিয়া মনে হয় এবং ঐ জন্যই মনকেও চেতনপদার্থ বলিয়া বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে যে জানতে পারবি না, একথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে আর ত কোন কারণ নেই—এক আত্মাই আছেন; সুতরাং যাকে জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইজন্য শ্রুতি বলছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" ফলকথা, conscious plane-এর (দ্বৈতভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণাদির দ্বৈতভান নেই। মন নিরুদ্ধ হলে তা প্রত্যক্ষ হয়। ভাষান্তর নেই বলে ঐ অবস্থাটিকে

'প্রত্যক্ষ' করা বলছি ; নতুবা সে অনুভব-প্রকাশের ভাষা নেই ! শঙ্করাচার্য্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে দ্বৈতভূমিতে তার আভাস দেন—সে জন্যই বলে (আপ্তপুরুষের) অনুভব হতেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্তু 'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে যাওয়ার' ন্যায় ; বুঝলি ? মোট কথা হচ্ছে যে, "তুই যে নিত্যকাল ব্রহ্ম" এই কথাটা জানতে হবে মাত্র ; তুই সর্ব্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা জড় মন (যাকে শাস্ত্রে মায়া বলে) এসে সেটা বুঝতে দিচ্ছে না ; সেই সূক্ষ্ম, জড়রূপ উপাদানে নির্ম্মিত মনরূপ পদার্থ টা প্রশমিত হলে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হয়। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকারস্বরূপ। পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে ; তখনই অনুভূতি হবে—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

অতঃপর স্বামীজী বলিলেন, "তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?—তবে শো।" শিষ্য স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। রাত্রে স্বামীজীর সুনিদ্রা না হওয়ায় মাঝে মাঝে উঠিতে লাগিলেন ; শিষ্যও তখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আবশ্যকমত সেবা করিতে লাগিল। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল এবং শেষরাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল

স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিবার জন্য তাহার মন এখন ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং ঐ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামীজী সম্মত হইলে, সে কতকগুলি ধুস্তূর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামিশরীরে মহাশিবের অনুষ্ঠান চিন্তা করত বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "তোর পূজো ত হল কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কিনা ঠাকুরের পূজোর বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পূজো করলি ?" কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, দেখ্, আজ কি কাণ্ড করেছে !! ঠাকুরের পূজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমায় পূজো করেছে।" স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা বেশ করেছে ; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন ?" কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।

শিষ্য গোঁড়া হিন্দু ; অখাদ্য দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্য্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজী শিষ্যকে কখন কখন 'ভট্‌চায' বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতর্জ্জলযোগসময়ে বিলাতি বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজী সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "ভট্‌চাযকে ধরে নিয়ে আয় ত।" আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজী ঐ-সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদস্বরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে

বলিলেন, "আজ কি খেলি তা জানিস্? এগুলি মুর্গির ডিমের তৈরী!" উত্তরে সে বলিল, "যাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।" শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আজ থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপ, পুণ্যাদি অভিমান জন্মের মত দূর হোক—আমি আশীর্ব্বাদ করছি।"

স্বামীজীর সেদিনকার অযাচিত অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া শিষ্য মানবজন্ম সার্থক হইয়াছে মনে করে।

অপরাহ্নে স্বামীজীর কাছে একাউন্টেণ্ট্ জেনারেল বাবু মন্মথ-নাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজে স্বামীজী অনেকদিন ইঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ঐসকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও অন্য নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "একদিন এখানে থেকেই যান না।" মন্মথ বাবু তাহাতে "আর একদিন এসে থাকা যাবে" বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়া নীচে নামিতে নামিতে জনৈক বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন, "ইনি যে পৃথিবীতে একটা মহাকাণ্ড করে তবে ছাড়বেন, তা আমরা পূর্ব্বেই মান্দ্রাজে টের পেয়েছিলুম। এমন সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা মানুষে দেখা যায় না।"

স্বামীজী মন্মথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধার অবধি আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন এবং ময়দানে কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

উনবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীর শিষ্যকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে উৎসাহিত করা—শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে এদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদিগের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—ইংলণ্ডে চাকুরে লোকদিগের হীনজ্ঞানে অবজ্ঞা—ভারতে শিক্ষিতাভিমানী লোকদিগের অকর্ম্মণ্যতা—যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে—ইতর জাতিদিগের কর্ম্ম-তৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা—ভারতের ভদ্রজাতীয়দিগের অপেক্ষা অধিক ইতর জাতিরা এইবার জাগিতেছে ও নিজ ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা ভদ্রসমাজের নিকট হইতে আদায় করিবার উপক্রম করিতেছে—ভদ্রজাতিরা তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে উভয় জাতিরই কল্যাণ হইবে—ইতরজাতীয়দের গীতোক্ত ভাবে শিক্ষা দিলে তাহারা নিজ নিজ জাতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করা দূরে থাকুক, গৌরবের সহিত সম্পন্ন করিতে থাকিবে—ভদ্রজাতীয়েরা ঐরূপে ইতরজাতীয়দের এখন সাহায্য না করিলে ভবিষ্যতে কি ফল দাঁড়াইবে।

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, "কি হবে আর চাকরি করে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।" শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাষ্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য্য-সম্বন্ধে শিষ্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "অনেক দিন মাষ্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারি করিস্ নি।"

শিষ্য। তবে কি করিব?

স্বামীজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-

উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য। কি ব্যবসায় করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজী। পাগলের মত কি বকছিস্? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তর্ তর্ করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি কচ্ছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস্। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস্! তোদের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটীগুণে ধন-ধান্য প্রসব করছেন সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা? ঘৃণিত কুক্কুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দ্দশা হয়েছে! তোরা আবার তোদের বেদবেদান্তের বড়াই করিস্! যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্মকর্ম্ম এখন গঙ্গায়

ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তৈয়ের করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস্!

শিষ্য। কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়?

স্বামীজী। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস্, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্, দেখবি মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে ত জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফিরি করগে। দেখবি —ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম—হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফিরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ্‌না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীতে আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরী করে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।

শিষ্য। মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজী। নেবে কি না, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি! আমার বহু বন্ধুবান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচয়) করে দিচ্ছি। তাদের ভেতর ঐগুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দেব। তারপর দেখবি—কত লোক তাদের follow (অনুসরণ) করবে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবি নি।

শিষ্য। ব্যবসায় করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজী। আমি যে করে হ'ক তোকে start (কার্য্যারম্ভ) করিয়ে দেব। তার পর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস্ তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফলতা) হয়, ত মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী। তাইত বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই—আত্ম-প্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম্ম। হয় ঐ প্রকার উদ্যোগ উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য, মান্য, শ্রীমান) হ—নয় ত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে তাঁদের উপকার কর। তবে ত আমাদের মত ভিক্ষা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারোর

দিকে চায় না। দেখছিস্ ত আমরা দুটো ধর্ম্মকথা শুনাই—তাই গেরস্থেরা আমাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবি নি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে, গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না!—কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম—যারা চাকরি করে parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দ্দিষ্ট। যারা নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বসবার জন্যই front seat (সামনের আসনগুলি)। ওসব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই করে করে—তোদের অন্ন পর্য্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই—তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষগুণ বিচার) করতে যাস্—আহাম্মক্! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্ম্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?

শিষ্য। মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজী। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই

তোদের কাছে শিক্ষিত হল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এইসব স্কুল কলেজে পড়ে, তোরা কেমন এক-প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণরোগাক্রান্ত) জাত তৈরী হচ্ছিস্। কেবল machine-এর (কলের) মত খাটছিস্, আর 'জায়স্ব' 'ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস্। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাস্—এদের কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে—মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (পয়সা) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল চাল বদলে দিচ্ছে—অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস্—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা, "হা চাকরি, যো চাকরি" করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য। মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতর জাতিসকল ত আমাদের বুদ্ধিতেই

চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজী। তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই না হয় না পড়েছে। তোদের মত শার্ট কোট পরে সভ্য না হয় নাই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কার্য্য বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা হুতাশ লেগে যায়—তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজোড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস্—আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই কচ্ছিস্?

জীবনসংগ্রামে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয় নি। এরা মানববুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে—আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জ্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরূপ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই! ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছে ও তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় ইতর জাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে

—ছোট লোকদের ভিতর আজকাল এত যে ধর্ম্মঘট হচ্ছে ওতেই ঐকথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা, ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই ত বলি, তোরা এই mass-এর (সাধারণ শ্রেণীর) ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বল্‌গে—"তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ —আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না।" তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও ত আবার কালে আমাদের মত উর্ব্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে ?

স্বামীজী। তা কেন হবে ? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে—জেলে জেলেই থাকবে—চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন ? "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে

কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম্ম যাতে আরও ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভদ্র জাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভেতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল বল দেখি? ঐরূপ sympathy (সহানুভূতি) ও সাহায্য পেলে মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠা-লাঠি করে, সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই mass (ভদ্রেতর সাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্র লোকদের) অত্যাচার বুঝ্‌তে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দেবে। ভেবে দেখ—গল্ জাতের হাতে—অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল। এই

জন্য বলি, এই সব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙ্গাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগ্‌বে—আর একদিন জাগ্‌বে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন—"ওসব কথা এখন থাক—তুই এখন কি স্থির কর্‌লি, তা বল্‌। যা হয় একটা কর। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ, নয়ত আমাদের মত 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে ত দেখছিস সবই ক্ষণিক—'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌'। —অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে ত আর কালবিলম্ব করিস্‌ নে। এখুনি অগ্রসর হ। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।' পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।'"

বিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

'উদ্বোধন' পত্রের প্রতিষ্ঠা—উক্ত পত্রের জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতের অশেষ কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার—কি উদ্দেশ্যে স্বামীজী ঐ পত্র বাহির করেন—ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তান-দিগের ত্যাগ ও অধ্যবসায়—গৃহীদের কল্যাণের জন্যই পত্রপ্রচারাদি—'উদ্বোধন' পত্র কি ভাবে চালাইতে হইবে—জীবন উচ্চভাবে গড়িবার উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে—কাহাকেও ঘৃণা বা ভয় দেখান কর্ত্তব্য নহে—ভারতের অবসন্নতা ঐরূপেই আসিয়াছে—শরীর সবল করা।

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া যায়, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর অর্থসাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামীজীর নিজের নিকটে এক সহস্র টাকা ছিল, ঠাকুরের একজন গৃহস্থ ভক্ত[১] আর এক সহস্র ধার দিলেন—ঐ টাকায় কার্য্যারম্ভ হইল। একটি প্রেস্[২] খরিদ করা হইল এবং শ্যামবাজার, রামচন্দ্র মৈত্রের গলিতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বাটীতে ঐ প্রেস স্থাপিত হইল।

১ ৺হরমোহন মিত্র।

২ প্রেসটি স্বামীজীর জীবনকালেই নানা কারণে বিক্রয় করা হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের 'উদ্বোধন' নাম মনোনীত করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বামীজীর আদেশে উহার মুদ্রণ ও প্রচারকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কখন ভক্ত-গৃহস্থের ভিক্ষান্নে, কখন অনশনে, কখন প্রেস ও পত্র-সংক্রান্ত কর্ম্মোপলক্ষে পায়ে হাঁটিয়া ৫ ক্রোশ পথ চলিয়া—এইরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত ঐ পত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, পয়সা দিয়া কর্ম্মচারী রাখিবার তখন সংস্থান ছিল না এবং স্বামীজীর আদেশ ছিল, পত্রের জন্য গচ্ছিত টাকার একটি পয়সাও পত্রে ব্যয় ভিন্ন অন্য কোনরূপে খরচ করিতে পারিবে না। স্বামী ত্রিগুণাতীত সেজন্য ভক্তদিগের আলয়ে ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে চালাইয়া ঐ আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণই এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। কোনরূপ অশ্লীলতাব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনাদি যাহাতে এই পত্রে প্রকাশিত না হয় সে বিষয়ও স্বামীজী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া

উপবেশন করিলে তিনি তাহার সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন—

স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস্?

শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম্ কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb-এর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর্। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন—তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস, ঠাকুরের এই সব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? ইহাদের যে যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ্। এই দেখ্, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কার্য্যে নেবেছে। এ কি কম sacrifice-এর

(ত্যাগস্বীকারের) কথা—আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্ দেখি! Success (কাজ হাসিল) করে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে!

স্বামীজী। কেন? পত্রের প্রচার ত গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাবপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে কচ্ছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল ও আয়-বৃদ্ধি) হয় ত এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘগঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কার্য্যে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা ত গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি নি। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কার্য্য)—এটা জেনে রাখবি।

শিষ্য। তাহা হইলেও—সকলে এভাব লইতে পারিবে না।

স্বামীজী। নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা criticism (নিন্দা সুখ্যাতি) গণ্য করে কার্য্যে অগ্রসর হই নি।

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী। তা ত বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য। আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজী। আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দেব। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করবার শক্তি তোদের এখনও হয় নি। সেটা করতে এই সব সর্ব্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ করে করে মরে যাবে তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (নিন্দা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস্!

শিষ্য। সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্রেসে পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজী। আমাদের centre (কেন্দ্র) ত ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ-ধারা)। ঠাকুরকে পূজা করে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে! কৈ আমায় ত পূজোর কথা কিছু বললে না?

শিষ্য। মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী

আমায় কল্য বলিলেন—"তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।"

স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস্ আমি তাঁর কার্য্যে খুব খুশি হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস্। উহাতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে 'উদ্বোধনে'র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরায় শিষ্যের সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতেছি।

স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (সকল বিষয় গড়িয়া তুলিবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thought (নেই নেই ভাবে) মানুষকে weak (নির্জীব) করে দেয়। দেখ্‌ছিস না, যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিন রাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে 'এটার কিছু হবে না', 'বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায় যারা ঐরূপ শিশুদের মত তাদের) সম্বন্ধেও তাই।

Positive idea (জীবনগড়ার ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐসব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"ধর্ম্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে, যার তার উপর নাক-সিটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিস্ নি। Physical, mental, spiritual (শরীর, মন ও আত্মা-সম্বন্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive idea (গড়িবার ভাব)-সকল দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (সবল হবার ও জীবন গড়বার ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদু-জাতটাকে তুলতে হবে—তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেন নি। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয়

দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুলতে হবে—জাগাতে হবে—বুঝলি ?

"তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই। তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মনুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে তোল্ দেখি। তবে জান্‌ব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস্—পারবি ?

শিষ্য। আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী। আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখ্‌ছিস্‌নে এখনও রোজ আমি ডাম্‌বেল কষি। রোজ রোজ সকালে সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে উন্নত হওয়া চাই)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন ? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

একবিংশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর আলিপুরের পশুশালা দেখিতে গমন—পশুশালা দেখিবার কালে কথোপকথন ও পরিহাস—দর্শনান্তে পশুশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের বাসায় চা-পান ও ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে কথোপকথন—ক্রমবিকাশের কারণ বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা চূড়ান্ত মীমাংসা নহে—ঐ বিষয়ের কারণ সম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলির মত—বাগবাজারে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীর পুনরায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কথোপকথন—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশের কারণ মানবেতর প্রাণিজগতে সত্য হইলেও মানবজগতে সংযম এবং ত্যাগই সর্ব্বোচ্চ পরিণামের কারণ—স্বামীজী সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বাগ্রে শরীর সবল করিতে কেন বলিয়াছেন।

আজ তিন দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারের ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতেছেন। অদ্য সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, "তোরা আগে চলে যা—আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।"

স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া ট্রামে করিয়া আড়াইটা আন্দাজ রওনা হইলেন। তখন ঘোড়ার ট্রাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় পশুশালায় উপস্থিত হইয়া তিনি বাগানের তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীজী আসিতেছেন শুনিয়া রামব্রহ্ম বাবু সাতিশয়

সন্তোষ লাভ করিলেন এবং স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাগানের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবুও পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া পশুশালার ভিতর লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্ম বাবু উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের মতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে, কখন কখন তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীব জন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, "এ থেকেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হয়েছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরে একস্থানে বসে থেকে ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হয়ে গিয়েছে।" কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, "তোরা না কচ্ছপ খাস্? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে;—তা হলে তোরা সাপও খাস্!" শিষ্য শুনিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া যাইলে যখন তাহার পূর্ব্বাকৃতি ও স্বভাব থাকে না,

তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল, একথা কেমন করিয়া বলিতেছেন ?”

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্ম বাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ ব্যাঘ্রাদি রক্ষিত ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্ম বাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহ ব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ-গর্জ্জন এবং সাগ্রহ-ভোজন শুনিবার ও দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থিত রামব্রহ্ম বাবুর বাসা-বাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতাস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্ম বাবু। ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

স্বামীজী। ডারুইনের কথা সঙ্গত হইলেও evolution-এর (ক্রমবিকাশবাদের) কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

রামব্রহ্ম বাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী। সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া আমার ধারণা।

রামব্রহ্ম বাবু। সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্ত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন), natural selection (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন) প্রভৃতি যেসকল নিয়ম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেসকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এসকলের একটিও উহার কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (অপরা-জাতি) থেকে আর এক species-এ (অপরা-জাতিতে) পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' (প্রকৃত্যাপূরাৎ) দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles-এর সঙ্গে দিন রাত struggle (লড়াই) করে যে উহা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয় (যাহা পাশ্চাত্ত্য দর্শন সমর্থন করে) তা হলে বলতে হয় এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা

সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশ-কল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায় জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্র ভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির এবং বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্ব্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরসমূহে যাই হোক, উচ্চস্তরসমূহে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয় ; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য্য না বলে কারণরূপে নির্দ্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নহে। হাজার পাপীর প্রাণ সংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্ত্য Struggle Theory বা জীবসকলের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতি-লাভরূপ মতটা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্ম বাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অবশেষে বলিলেন—"আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অভিজ্ঞ

লোকের ভারতবর্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিকাশ-বাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।"

বিদায়কালে রামব্রহ্ম বাবু বাগানের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া স্বামীজীকে বিদায় দিলেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে সুবিধামত পুনরায় একদিন নিরিবিলি দেখা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবু এ জীবনে স্বামীজীর নিকট আসিবার ঐ অবসর পাইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। কারণ এ ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্ব্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে স্বামী যোগানন্দ, ৺শরচ্চন্দ্র সরকার, শশিভূষণ ঘোষ (ডাক্তার), বিপিনবিহারী ঘোষ (ডাক্তার), শান্তিরাম ঘোষ প্রভৃতি পরিচিত বন্ধুগণ এবং স্বামীজীর দর্শনাভিলাষে আগত অপরিচিত পাঁচ-ছয় জন লোকও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী অদ্য পশুশালা দেখিতে যাইয়া রামব্রহ্ম বাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া ইঁহারা সকলেই ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব তিনি আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য। মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজী। কেন, কি বুঝিস্ নি?

শিষ্য। এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উল্টা কথা বলিলেন।

স্বামীজী। উল্টো বলব কেন? তুই-ই বুঝতে পারিস্ নি। Animal kingdom বা নিম্ন প্রাণিজগতে আমরা সত্যসত্যই struggle for existence, survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom বা মনুষ্য জগতে, যেখানে rationality-র (জ্ঞান-বুদ্ধির) বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। মনে কর্, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক বড়লোক) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom বা মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয় ততই তাতে rationality-র (জ্ঞান-বুদ্ধির) বিকাশ। এই জন্য animal kingdom-এর ন্যায় rational human kingdom-এ পরের ধ্বংসসাধন কোরে progress (উন্নতি)

হতে পারে না। মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগের) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory—(জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom-এ (মানবেতর প্রাণিজগতে) স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence-এ (মানবজীবনে) মনের ওপর আধিপত্য-লাভের জন্য বা সত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজী। তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হলে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) করবি কি করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণ

বিকাশস্থল) মানুষপদবাচ্য আছিস্? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাস্ নি এই ঢের। ঠাকুর বল্‌তেন, "মান হুঁশ আছে যার সেই মানুষ",—তোরা ত 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস্। তোরা animal (মানবেতর প্রাণীর মধ্যে), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি। থিওরী-ফিওরী রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা করে দেখ্ দেখি, তোরা animal and human planes-এর (মানব এবং মানবেতর ভূমির) মধ্যবর্ত্তী জীব-বিশেষ কি না! Physique-টাকে (দেহটাকে) আগে গড়ে তোল্। তবে ত মনের উপর ক্রমে আধিপত্যলাভ হবে —"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" !—বুঝ্‌লি।

শিষ্য। মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু "ব্রহ্মচর্য্য-হীনেন" বলেছেন!

স্বামীজী। তা বলুন্‌গে। আমি বলছি—The physically weak are unfit for the realisation of the Self (দুর্ব্বল শরীরে আত্মসাক্ষাৎকারলাভ হয় না)।

শিষ্য। কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও ত দেখা যায়।

স্বামীজী। তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস্ তা হলে তারা যত শীগ্‌গীর তা work out (কার্য্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য্য লোক তত শীগ্‌গীর পারবে না। দেখছিস্ না, ক্ষীণশরীরে কাম-ক্রোধের

বেগধারণ হয় না। শুঁট্‌কো লোকগুলো শীগ্‌গীর রেগে যায় —শীগ্‌গীর কামমোহিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী। তা নেই কে বলছে? মনের উপর একবার control (আধিপত্যলাভ) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক্ বা শুকিয়েই যাক্, তাতে আর আসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে সে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না; ঠাকুর বল্‌তেন, "শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজী উত্তেজিত হইয়াছেন দেখিয়া শিষ্য সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্বামীজীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন— "আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভট্‌চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না—কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?"

শিষ্য। তা আপনিই ত আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম—আপনি পান করিয়া দিলেন কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মানবে না!

শিষ্য। না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে
চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় ১২॥০ হইয়া গেল। শিষ্য ঐ রাত্রে বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাকাডাকি করিয়া কাহাকেও জাগাইতে না পারিয়া তাহাকে অগত্যা বাসার রোয়াকে শুইয়া সে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল।

কালচক্রের কঠোর পরিবর্ত্তনে স্বামীজী, স্বামী যোগানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা আজ আর নরশরীরে নাই। তাঁহাদের জীবনের পবিত্র স্মৃতিমাত্রই কেবল পড়িয়া রহিয়াছে।—এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তার যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়া শিষ্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে।

দ্বাবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে স্বামীজীর অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার বাসনা—মঠে ব্রহ্মচারীদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প ছিল—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, অন্নসত্র ও সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মবিদ্যালাভে যোগ্য করিবার অভিপ্রায়—উহাতে সাধারণের কি কল্যাণ হইবে—পরার্থকর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না—মায়ার আবরণ সরিয়া গেলেই সকল জীবের ব্রহ্মবিকাশ হয়—ঐরূপ ব্রহ্মবিকাশে সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ হয়—মঠকে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করা—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সংসারে সকল প্রকার অবস্থায় অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, ইহা দেখাইতে স্বামীজীর আগমন—এক-শ্রেণীর বেদান্তবাদীর মত, সংসারের সকলে যতক্ষণ না মুক্ত হইবে, ততক্ষণ তোমার মুক্তি অসম্ভব—ব্রহ্মজ্ঞানলাভে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ, সকল জীবকে নিজসত্তা বলিয়া অনুভব হয়—অজ্ঞান-অবলম্বনেই সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার চলিয়াছে—অজ্ঞানের আদি ও অন্ত—শাস্ত্রোক্তি, অজ্ঞান প্রবাহরূপে নিত্য-প্রায় কিন্তু সান্ত—নিখিলব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—যাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই তদ্বিষয়ের অধ্যাস হয় কি না—ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ মূকাস্বাদনবৎ।

আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান মঠের জমিও অল্প দিন হইল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখন জঙ্গলপূর্ণ, জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠাবাড়ী ছিল; উহারই সংস্করণে বর্ত্তমান মঠ-বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্য্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বলিলেন, "এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন, জ্ঞানচর্চ্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র সমন্বয়ে এইখান থেকে ideals (মানবহিতকর উচ্চাদর্শসকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্ম্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে ঐরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।

"মঠের ঐ যে দক্ষিণ ভাগের জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তি শাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস করে শাস্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন-বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। ঐ সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর training-এর (শিক্ষালাভের) পর ইচ্ছে হলে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে পারবে। মঠের মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছে হলে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, তাদের মঠস্বামিগণ তখনি বহিষ্কৃত করে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন করান হবে।

এতে যাদের objection (আপত্তি) থাকবে তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে। তারা অধ্যয়নমাত্র সকলের সহিত একত্র করবে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হলে কেহ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারবে না। ক্রমে এইরূপে যখন এই মঠের কার্য্য আরম্ভ হবে, তখন কেমন হবে বল্ দেখি?”

শিষ্য। আপনি তবে প্রাচীন কালের মত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান?

স্বামীজী। নয় ত কি? Modern system of education-এ (বর্ত্তমানে দেশে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে) ব্রহ্মবিদ্যা-বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নেই। পূর্ব্বের মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে, এখন broad basis-এর (উদারভাবসমূহের) ওপর তার foundation (ভিত্তিস্থাপন) করতে হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্ত্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে বলব।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—“মঠের দক্ষিণে ঐ যে জমিটা আছে, ঐটেও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের অন্নসত্র হবে। ঐখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবার বন্দোবস্ত থাকবে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন funds (টাকা) জুটবে, সেই অনুসারে অন্নসত্র প্রথম খুলতে হবে। চাই কি প্রথমে দু-তিনটি লোক নিয়ে start

(কার্য্যারম্ভ) করতে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারিগণকে এই অন্নসত্র চালাতে train করতে (শিখাইতে) হবে। তাদের যোগাড়-সোগাড় করে—চাই কি ভিক্ষা করে—এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ বিষয়ে কোনরূপ অর্থসাহায্য করতে পারবে না। ব্রহ্মচারিগণকেই ওর জন্য অর্থসংগ্রহ করে আনতে হবে। সেবাসত্রে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হলে তবে তারা বিদ্যামন্দির-শাখায় প্রবেশাধিকারলাভ করতে পারবে। অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর—একুনে দশ বৎসর training-এর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে—অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে হয় ও মঠের অধ্যক্ষগণের তাদের উপযুক্ত অধিকারী বুঝে সন্ন্যাসী করা অভিমত হয়। তবে, মঠাধ্যক্ষ কোন কোন বিশেষসদ্গুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়ম ব্যতিক্রম করে তাকে যখন ইচ্ছে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বল্লুম সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার মাথায় এই সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য। মহাশয়, মঠে এইরূপ তিনটি শাখাস্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে?

স্বামীজী। বুঝ্লি নি? প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্ব্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে। অন্নদান করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থকর্ম্মতৎপরতা ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্ম্মল হয়ে তাতে

সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

শিষ্য। মহাশয়, জ্ঞানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানের শাখাস্থাপনের প্রয়োজন কি ?

স্বামীজী। তুই এতক্ষণেও কথাটা বুঝতে পার্‌লি নি! শোন্—এই অন্ন-হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে, সেবাকল্পে দীন-দুঃখীকে ভিক্ষা-শিক্ষা করে, যেরূপে হ'ক—দুমুটো অন্ন দিতে পারিস, তা হলে জীব জগৎ ও তোর মঙ্গল ত হবেই—সঙ্গে সঙ্গেই তুই এই সৎকার্য্যের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। ঐ সৎকার্য্যের জন্য তোকে বিশ্বাস করে কামকাঞ্চনবদ্ধ সংসারী জীব তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কার্য্যে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি তত আর কোন কার্য্যে পাবি নি। যথার্থ সৎকার্য্যে মানুষ কেন, ভগবানও সহায় হন। এইরূপে লোক আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি। তাই আগে অন্নদান।

শিষ্য। মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম স্থান চাই; তারপর ঐজন্য ঘর-দ্বার নির্ম্মাণ করা চাই, তার পর কাজ চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে ?

স্বামীজী। মঠের দক্ষিণদিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি ও ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি দুটি

অন্ধ আতুর সন্ধান করে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা করে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি—তোর এই কার্য্যে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

শিষ্য। হাঁ, তাহা বটে। কিন্তু ঐরূপে নিরন্তর কর্ম্ম করিতে করিতে কালে কর্ম্মবন্ধন ত ঘটিতে পারে?

স্বামীজী। কর্ম্মের ফলে তোর যদি দৃষ্টি না থাকে ও সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হলে ঐ সব সৎকার্য্য তোর কর্ম্মবন্ধনমোচনেই সহায়তা করবে। ঐরূপ কর্ম্মে বন্ধন আসবে!—ওকথা তুই কি বলছিস্? এইরূপ পরার্থ কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়! "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শিষ্য। আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী। গরীব-দুঃখীদের জন্য well-ventilated (বায়ু-প্রবেশের উত্তমপথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দুই জন কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের উত্তম বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবে। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। সেবাশ্রমটি অন্নসত্রের ভেতর একটা ward-এর (বিভাগের) মত থাকবে,

তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্" এই রব উঠবে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য। আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টি বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী গঙ্গাপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেন— "তোদের ভেতর কবে কার সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন ত দুনিয়াময় অমন কত অন্নসত্র হবে। কি জানিস্, জ্ঞান শক্তি ভক্তি সকলই সর্ব্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। উহাদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি ও ইহাকে বড় উহাকে ছোট বলে মনে করি। জীবের মনের ভিতর একটা পর্দ্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল করে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই ব্যস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।"

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের ভিতরের ঐ পর্দ্দাটা কবে সরিয়া যাইয়া তাহার ঈশ্বরদর্শন হইবে!

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর করেন ত এই মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের

সর্ব্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্ত্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্ব্বমত, সর্ব্বপথ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখতে পায়, তা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হল—যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলছে! আমি ত যথাসাধ্য করছি ও করব—তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে; কেবল বেদান্ত পড়ে কি হবে? Practical life-এ (দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনে) শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এই অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্ব্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্ব্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।"

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যানসহায়ে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজী। সেটা ত নেশা করে অচেতন হয়ে থাকার মত; শুধু ঐরূপ থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা তাণ্ডব নৃত্য করবি, কখনও বা বুঁদ হয়ে থাকবি। ভাল জিনিস পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতিলাভ করে না হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন

খসিয়ে দিতে হবে! তখনি নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে!—'নিরবধি গগনাভং'—আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্ব্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মত যত্ন না করে থাকতে পারবি নি। এইরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta (কর্ম্মের ভিতর বেদান্তের অনুভূতি)—বুঝ্‌লি। তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যবহারিক ভাবে বহুরূপে সামনে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম-রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে পাস্—একমাত্র মাটি, যা এর প্রকৃত সত্তা। সেইরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ সব ভাবছিস্ ও দেখছিস্। জ্ঞান-প্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব কোন সত্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন যা কিছু—সবই নামরূপসহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল, তখনি ব্রহ্ম-সত্তা-অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য। এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। কোত্থেকে এল তা পরে বলব। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়তে লাগ্‌লি, তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল? —না, তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন করে ছুটিয়েছিল?

শিষ্য। অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী। তা হলে ভেবে দেখ্—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া

বলে জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্ব্বকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কি না?—তখন নামরূপ মিথ্যা বলে বোধ হবে কি না?

শিষ্য। তা হবে।

স্বামীজী। তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। এইরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল। এই অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব্ববিভাসক আত্মার সত্তা বুঝতে পারিস নে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্তাটাকে কেবল অনুভব করবি তখনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মানুভূতি হবে—তখনি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। যে জিনিসটা পরে থাকে না—সে জিনিসটা যে মিথ্যা, তা ত বুঝতে পেরেছিস্? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে, সে বলবে অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে—সাপ বলে দেখতে পায় না। যারা দড়াকে সাপ বলে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! সেজন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নেই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না। "সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো"। যে জিনিসটা এইরূপে মিথ্যা

বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি ? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হতে পারে না। কেন তা শোন্। এই প্রশ্নোত্তরটাও ত সেই নামরূপ বা দেশকাল ধরে করা হচ্ছে ? যে ব্রহ্মবস্তু নামরূপ দেশকালের অতীত, তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বুঝান যায় ? এইজন্য শাস্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারিক ভাবে সত্য—পারমার্থিক রূপে সত্য নয়। অজ্ঞানের স্বরূপই নাই, তা আবার কি বুঝবি ? যখন ব্রহ্মের প্রকাশ হবে, তখন আর ঐরূপ প্রশ্ন করবার অবসরই থাকবে না। ঠাকুরের সেই 'মুচি-মুটের' গল্প শুনেছিস না ?—ঠিক তাই। অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে ?

স্বামীজী। যে জিনিসটাই নেই, তা আবার আসবে কি করে ? থাকলে ত আসবে ?

শিষ্য। তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল ?

স্বামীজী। এক ব্রহ্মসত্তাই ত রয়েছেন ! তুই মিথ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখ্ছিস।

শিষ্য। এই মিথ্যা নাম-রূপই বা কেন ? কোথা হইতে আসিল ?

স্বামীজী। শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহ-রূপে নিত্যপ্রায় বলেছে। কিন্তু উহা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্ব্বদা দড়ার মত স্বস্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্য বেদান্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নি। বুঝ্লি ?

শিষ্য। একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী। কি বল্ না?

শিষ্য। এই যে আপনি বলিলেন, এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাদের কোন স্বরূপসত্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই, সে জিনিসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন সর্পভ্রম হয় না, সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই, তার ব্রহ্মে সৃষ্টিভ্রম হইবে কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে! ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখছেন। রজ্জুই দেখছেন, সাপ দেখছেন না। তুই যদি বলিস্, 'আমি ত এই সৃষ্টি বা সাপ দেখছি'—তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। যখন তাঁর উপদেশ ও বিচার বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান ও সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস্? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্টি-জ্ঞানাদি চলে এসে থাকে ত থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ না হলে এ প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত মীমাংসা হতে পারে না; এবং তখন আর প্রশ্নও

উঠে না, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন 'মূকাস্বাদনবৎ' হয়।

শিষ্য। তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজী। ঐ বিষয়টি বুঝ্‌বার জন্য বিচার। সত্যবস্তু কিন্তু বিচারের পারে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"।

এইরূপ কথা হইতে হইতে শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজী মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"